


অগ্নিমিত্র

একমাত্র পরিবেশক :

**ইণ্ডিয়ানা**

২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ প্রথম প্রকাশ ॥

নব বর্ষ, ১৩৬৬

এপ্রিল, ১৯৫৯

॥ প্রকাশক ॥

'সুধী পরিষদ'-এর পক্ষে

শ্রীগুরুপদ চক্রবর্তী।

২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

॥ প্রচ্ছদ শিল্পী ॥

শ্রীগণেশ বসু

॥ মুদ্রক ॥

শ্রীবাবুলাল প্রামানিক

সোমা প্রকাশন,

২এ, কেদারনাথ দত্ত লেন,

কলিকাতা-৬

॥ তিন টাকা ॥

# উত্তর মৌসুম

আরণ্য-জনপদের আদিম সুস্থ জীবন-পিয়াসী .....

মানব-মানবীর উদ্দেশ্যে—

কুশমণ্ডলের করালী সর্দার ছিল ডাকসাইটে মানুষ। রক্তের তেজ ছিল অফুরন্ত, বুকের পাটাও তেমনি। যে কাজে জোর জুলুমের ছিটেফোঁটাও নেই, তেমন কাজ করালী কখনো করেনি। নিজের কাজের কৈফিয়ৎও সে কাউকে কোনোদিন দেয়নি। আকণ্ঠ কাঁচি মদ খেয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটতে পারতো লোকটা। পা টল্‌তে দেখেনি কেউ।

করালীকে ভয় করতো সবাই। বিশেষ ক'রে এড়িয়ে চলতো অশান্তির ভয়ে। কি ভুঁইঞা, কি দিগ্‌, কি বাগাল-সমাজ। ভূমিজরাও ভয় করতো। আবার তারাই আড়ালে বড়াই করতো করালীকে নিয়ে। তবু ভূমিজ সমাজে এমন একটা জোয়ান মরদ আছে, যার দাপটে লোকে কাঁপে। বড়াইয়ের ঝাঁজটা ভুঁইঞাদের ওপরেই যেন কিছু বেশী। লোকে বলে, করালীর এক পূর্বপুরুষকে তখনকার ভুঁইঞারা নাকি রঙ্কিনীর পুজোয় নরবলি দিয়েছিল। তখন কোম্পানীর আমল। তারপর প্রায় একশো বছর কেটেছে। কিন্তু জনশ্রুতিটা লোকের মুখে মুখে এ পুরুষেও এসে পৌঁছেছে। সেই ভুঁইঞাদের সঙ্গেই এক দিন করালী সর্দারের গোলমাল বাধলো।

একদিকে তিন গাঁয়ের ভুঁইঞারা, অন্যদিকে করালী সর্দার।

ভুঁইঞা আর ভূমিজের ইজ্জতের লড়াই। বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়লো প্রায় সারা পরগণায়। করালীর পেছনে এসে দাঁড়ালে সারা তল্লাটের ভূমিজ জোয়ানেরা। করালী হ'ল ভূমিজ সমাজের গর্ব। কাজটা তার ন্যায় হ'ক অন্যায় হ'ক সেটা বড়ো কথা নয়। তার চেয়েও বড়ো কথা—ভূমিজের ইজ্জত।

রামরতন ভুঁইঞার পড়তি ঘর। তারই রূপসী মেয়ে চাঁদী। এক কুড়িও বয়স হয়নি মেয়েটার। নিকষ কালো গায়ের রং। যেন তেল মাখানো কষ্টিপাথর। নিখুঁৎ গড়ন, নিটোল যৌবন। চাউনিতে বিজলীর ঝলক। পড়তি ঘর হ'লেও একটা মাত্র মেয়েকে সাজিয়ে রাখতে ত্রুটি করেনি রামরতন। যেমন যেমন মানায় ঠিক তেমন তেমন অলংকার

তার অঙ্গ জুড়ে। রূপ আর রূপোর জৌলুষ মিলে মিশে একাকার। রূপে রূপসী, গরবে গরবিনী। কিন্তু গুণের পরখ হয়নি তখনো। নজর ছিল অনেক ভুঁইঞা জোয়ানের। কিন্তু মেয়েটার দেমাকের গড়-পরিখা পার হ'য়ে মনের নাগাল পায়নি কেউ।

সেই মেয়েটাই পড়লো করালী সর্দারের নজরে। তার বয়স তখন চারের কোঠায় পৌছয়নি। ঘরে সোমত্ত বউ, তবু চাঁদীকে তার চাই। অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা। ইজ্জত খুইয়ে ভুঁইঞারা ভূমিজের ঘরে মেয়ে কোনোদিন দেয়নি, দেবেও না। বুদ্ধিতে বুঝলেও করালীর মন মানেনি। বিবেচনার ঝাড়ফুঁকে কি বাসনার আগুন নেভে কখনো? সে আগুন আরও দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। দলবল নিয়ে চড়াও হ'য়ে চাঁদীকে সে সত্যিই একদিন ছিনিয়ে নিয়ে এলো। ডগ্‌ডগে লাল সিঁদুর ঘষে দিলে বীর্যশুল্কা মেয়েটার কপালে। আদিম কামনার নির্বিচার প্রকাশ। সেই সিঁদুরের আড়ালে মেয়েটার অতীত পরিচয় চিরকালের মতো ঢাকা পড়ে গেল। চাঁদী আর ভুঁইঞা ঘরের মেয়ে নয়। সে করালী ভূমিজের সিঁদুর-ঘষা টানাবিয়ার ক'নে।

দেখতে দেখতে ও পক্ষেও প্রতিহিংসার আগুন জ্বললো। রক্ত কিছু যায় যাক, তবু বিহিত একটা চাই। হাতে হাতে উঠলো লাঠি, টাঙ্গি আর বল্লম।

শেষ পর্যন্ত অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো বলা যায় না। খুন-জখম ঘটে যাবার আগেই ভুঁইঞাদের উদ্যত গোখরো-ফণায় শঙ্খচূড়ের ছোবল দিলে তাদেরই মেয়ে চাঁদী। তিন গাঁয়ের মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে মেয়েটা স্পষ্ট বললে, সে করালী সর্দারের ঘর ক'রতে রাজী হ'য়েই কপালে সিঁদুর নিয়েছে। বিয়ে করা বউয়ের সম্মান কেউ কোনোদিন দেবে না, সবাই বলবে করালীর মেয়েমানুষ। চাঁদী তা জান্‌তো। তবু বেপরোয়া মেয়েটা তাতেই রাজী।

তীব্র বিষের জ্বালা নিয়ে ফিরে গেল ভুঁইঞারা। সে অপমানের মাশুল দিতে হ'ল মেয়ের বাপকে। চাঁদীকে যে মুহূর্তে ভূমিজ পুরুষ ছুঁয়েছে সেই মুহূর্তেই সমাজে পতিত হ'য়েছে রামরতন। গাঁওলা পঞ্চের অমোঘ বিধান। নড়চড় হবার উপায় নেই। রামরতনকে জাতে উঠতে হবে, প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে তিন গাঁয়ের ভুঁইঞা সমাজকে ভোজ দিয়ে।

তাই করে সমাজে উঠলে রামরতন। ছাগলের মাংস, ভাত আর হাড়িয়ার অঢেল আয়োজনে ত্রুটি করবার উপায় ছিল না। শেষ সম্বলটুকু নিঃশেষে বিকিয়ে দিয়ে ইজ্জত তার বাঁচলো। সেই ইজ্জতটুকু মাত্র সম্বল ক'রে হঠাৎ একরাতে সেই যে সে কুশমণ্ডলের বাস তুলে দিয়ে উধাও হ'ল, তারপর আর কেউ তাকে দেখেনি।

এত কাণ্ডের পরেও করালী নির্বিকার। মাঝে মাঝে ভীতু বাপের কথা তুলে চাঁদীকে খোঁটা দিয়ে মজা করতো। নেশার ঝোঁকে মারতে মারতে মেয়েটাকে কতদিন যে আধমরা করে ছেড়েছে তার ঠিক নেই। তবু চাঁদীর টান কমেনি। অদ্ভুত মানুষ। চিরকাল আপন খেয়ালে আর দাপটে একই ভাবে জীবন কাটিয়ে গেল। একমাত্র মৃত্যুর ওপরই তার জুলুম খাটেনি।

সেই করালী সর্দারের নাতি সুদাম।

বিশবাইশ বছরের জোয়ান। বাপের চেয়ে লম্বা চওড়া। পেটা গড়নের শরীর। দেহের নিকষ কালো বর্ণটুকুর মধ্যে খাদ নেই। সারা দেহে নিটোল স্বাস্থ্য। কেবল উঁচু চোয়াল দু'টোর জন্যেই তার মুখখানা কেমন রুক্ষ দেখায়। করালী সর্দারকে যারা দেখেছে তারা বলে পিতামহের চেহারাটা এক পুরুষ ডিঙিয়ে এসে ধরা দিয়েছে নাতির কাছে। সেই চেহারা, সেই একরোখা গোঁ, সেই নেশার আসক্তি। সবকিছুই করালী সর্দারের মতো। কেবল একটা জায়গায় দু'জনের আকাশ পাতাল তফাৎ। সুদাম কখনো যেচে কারো ক্ষতি করেনি। অথচ নেশার ঝোঁকে করালী সর্দার যেমন পিটপিট ক'রে বিশ্রী একটা নির্মম দৃষ্টি নিয়ে তাকাতো, সুদামের চাউনিটাও যেন অবিকল সেই রকম। তাই করালীকে যারা দেখেছে তারা অবাক হয়।

প্রায় তিন বছর হ'য়ে এলো মৌলবনী স্টেশনের ভেণ্ডার ভরতলালের দোকানে কারিগরের কাজ ক'রছে সুদাম। স্টেশনের অনিয়মে তার স্বাস্থ্যের জৌলুষ কিছু ক'মেছে। প্রথম কাজে ঢোকার সময় চেহারা যেমন ছিল তেমন আর নেই। তার ওপর সময়ে অসময়ে হাড়িয়া কিম্বা মহুলের মদ তো আছেই।

না থাকলে তুই একেবারে খাঁটি সোনা হতিস্ রে সুদাম!

কথাটা শুনতে ভারী ভালো লাগে সুদামের। আগে একগাল হেসে বলতো, এজ্ঞা তাই বটে। আজকাল একটা সুবিধাজনক জবাব তার ঠোঁটের আগায়। মদ খাওয়ার কথাটা উঠলেই বলে, এজ্ঞা, খাদ একটুন মিশাল না দিলে কাঁচা সোনাকে কিছু তিয়ার হয় বাবু? তাইতো উ খাদটো মিশাই লিলম।

রায়বাবু দু'একবার জিজ্ঞাসা ক'রেছেন, তা খাদটা মিশিয়ে কি এমন দ্রব্যটি তুমি তৈরী ক'রবে চাঁদ?

একগাল হেসে জবাবটা এড়িয়ে গেছে সুদাম। এই একটা প্রশ্নের জবাব। সে কাউকে দেয় না। প্রশ্ন করলেই একগাল হেসে বলে, এজ্ঞা, সেট কিছু কি ঠিক আছে?

এই একটা প্রসঙ্গেই সুদাম একেবারে চাপা।

ভূমিজের ছেলে। মাটিকে বড়ো গভীর মমতায় সে ভালোবেসেছে। ভূমি থেকে জন্ম, তাই ভূমিজ। মাটিই আদি, মাটিই অন্ত। মাটির সঙ্গেই ভূমিজের নাড়ীর সম্বন্ধ।

করালী সর্দার যেটুকু রেখে গেছে, তার ওপর ছটাক জমিও বাড়াতে পারেনি জটাধর সর্দার। মনে মনে সে দায়িত্ব সুদাম নিজে নিয়েছে। ভরতলালের কাছে মাইনের টাকা থেকে জমিয়ে জমিয়ে এরই মধ্যে কয়েক কুড়ি টাকাও তার হ'য়েছে। আরও দু'চার বছর হযতো এখানে কাজ ক'রতে হবে। তারপর অন্য জীবন। ভূমিজের ছেলে তার সবচেয়ে আপন জন সেই মাটির কাছেই ফিরে যাবে।

মাটি, মেঘ আর ধান। মাটি-মা আর আকাশ-দেবতার দয়ায় ধানের শীষে শীষে লক্ষ্মীর আসন। বেইমান না হ'লে সে লক্ষ্মীকে কেউ তাড়ায়?

সেই না-তাড়ানোর নেশায় পেয়েছে সুদামকে।

তবু এই স্টেশন, এই দোকান, এর ছুটোছুটি, এর গুমোট নীরবতা—সবকিছু তাকে মায়ায় জড়িয়ে ফেলেছে। এও একটা নেশা। অদ্ভুত একটা মাতন আছে মৌলবনী স্টেশনে। প্রায় তিনপাশে পাহাড়-ঘেরা বিস্তীর্ণ উপত্যকার ওপর দিয়ে শিবের মতো কঠিন বুক পেতে দিয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে রেল লাইনটা। ওদিকে ঝাড়গ্রাম, এদিকে টাটানগর পর্যন্ত

তার বোঝা আছে। অন্যদের তুলনায় মৌলবনী স্টেশনটা অতি তুচ্ছ। তবু তার মায়া প'ড়ে গেছে। স্টেশনঘর, দোকান, প্লাটফরম এমন কি লোহার বেড়ার গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বহু প্রাচীন আসন গাছটাও তার মায়ার জিনিস।

সামনের টুসুপরবে তিন বছর পুরে যাবে। এর ভেতর প্রতি বছরই বর্ষা আর হেমন্তে দু'বার ক'রে এক মাসের মেয়াদে ছুটি নিয়ে সে কুশ-মণ্ডলে কাটিয়ে এসেছে। কোনো অজুহাতেই ওই দু'বার ভরতলাল তাকে আটকে রাখতে পারেনি। জমিতে ধান দেওয়া আর ধান কাটার সময় এলেই ছটফট করতে থাকে সুদাম। মৌলবনীর নেশা-জড়ানো দিনগুলোও তখন তার কাছে বিস্বাদ হ'য়ে যায়।

বছরের ওই দুটো সময় ছেড়ে দিলে বাদবাকী সময়ে সুদাম দু'হাতে যেন চার হাতের কাজ সামলায়। মনে মনে ভরতলাল তারিফ করে। প্রকাশ করতে ভয় পায়। আদিবাসীদের বিশ্বাস নেই। ওবা শাঁখের করাত। তারিফ করলে মাথায় চ'ড়ে বসবে, গালমন্দ ক'রলে হয়তো হুট করে কাজে ইস্তফা দিয়ে হাঁটা দেবে। অশান্তির ভয় দু'দিকেই। তার ওপর তৃতীয় অশান্তি, মাঝে মাঝে সুদামেব কী যেন হয়। হঠাৎ কাজ ছেড়ে বাইরে বেঞ্চির ওপর ব'সে সিদ্ধাই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বিড়ির পর বিড়ি ফুঁকতে থাকে। নয়তো একপেট মদ গিলে এসে আসন গাছটার গোড়ায় ব'সে জড়ানো গলায় ঝুমুর গানের সুর ভাঁজে। সে সময় ডাকলেও সে কথায় কান দেয় না।

সুদামের এই খামখেয়ালিটুকু ভরতলাল সহ্য ক'রতে পারে না। তবু মুখ বুজে থাকে। আপন মনে বিড়বিড় ক'রে আদিবাসীদের শ্রাদ্ধ করে। সে বিষয়ী লোক। সুদূব চম্পারণ থেকে এসে বারো বছর ধ'রে সিংভূমের এই রুক্ষ মাটি কামড়ে প'ড়ে আছে দুটো পয়সার আশায়। সুদামের কাজের দাম সে বোঝে ব'লেই নিরুপায়ভাবে মানিয়ে চলে।

শুধু মাটির টান নয়, আর একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে কুশমণ্ডলে। মাটি বোবা—সে নিজে ডাকে না। কিন্তু সুদামেব চোখের সামনে যে এক-জোড়া ডাগর চোখ ভেসে ওঠে তার ডাক বোবা নয়। সেই সঙ্গে যেন কানে এসে বাজতে থাকে মেয়েটার খিলখিল হাসির লহরগুলো। মানীর কথা মনে পড়তেই আর কাজে মন বসে না সুদামের। মৌলবনী থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ কুশমণ্ডল। তবু কাজের চাপে যাওয়া হ'য়ে ওঠে

না। তাই মন যেন আরও ছটফট করে। কাজ ফেলে সে বেরিয়ে আসে।

মিতাই গোপের মেয়ে মানী।

ঠিক যেন সোবনরেখা নদীটার মতো। বড়ো চঞ্চল, বড়ো আঁকাবাঁকা। একদণ্ড স্থির হ'য়ে বসতে শেখেনি। হাসছে তো হাসছেই। আবার মুখ ভার হ'ল তো যেন শাওন মেঘ। কথায় কথায় গাল ফোলে, কথায় কথায় মান। নামটাও তেমনি মানানসই। তার মান ভাঙাতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। তবু সুদামের ভালো লাগে। হয়তো বেশী ভালো লাগে ওই অবুঝ মানটুকুতে। মানীর কথা সে ভাবে আর ভাবে। সে ভাবনার না আছে আদি, না আছে অন্ত।

আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে দু'জনের কথা। করালী সর্দার আর ভূঁইঞার মেয়ে চাঁদী। চাঁদীকে সারাজীবন খোরপোষ দিয়েছে সত্যি, কিন্তু তার ইজ্জতের কথাটা করালী কোনদিন ভাবেনি। বুড়ীটা ম'রেছে এই বছর সাতেক আগে। ভরা বয়সের তেজ আর তার শেষ বয়সে ছিল না। করালী মারা যাবার আগে থেকেই বুড়ী অনেক সময় আপন মনে কাঁদতো। বুড়ীর জলভরা চোখ দুটো যেন সুদামের চোখের সামনে এখনো ভাসে। নিজের পেটের ছেলে ছিল না—জটাধরই তার ছেলের মতো। তার চেয়ে বেশী আপন ভাবতো নাতিকে। জটাধর যাহ'ক মরণ পর্যন্ত বুড়ীকে খেতে পরতে দিয়েছে; কিন্তু করালী সর্দারের দেওয়া সিঁদুর কপালে নিয়ে যে যুবতী মেয়েটা একদিন ভূঁইঞার ঘর থেকে ভূমিজের ঘরে নেমে এসেছিল, তার হারানো ইজ্জতটুকু কেউই তাকে কোনদিন আর ফিরিয়ে দিতে পারেনি।

মানীর কথা ভাবতেই তাই সুদামের বুকটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। বাগালের ঘরের মেয়ে মানী। সেই একই ইজ্জতের ব্যাপার।

করালী সর্দার আর তার নাতি।

সেই একই রোখ। শিরায় শিরায় সেই একই রক্তের ধারা।

ভাবতে ভাবতে কোনো উপায় না পেয়ে বিরক্ত হ'যে শেষে কয়েক ঢোক মদ গিলে এসে ঝুমুর গানের সুর ভাঁজতে আরম্ভ করে সুদাম। তারপর যখন গাড়ী আসার সময় হয় তখন আপনিই গিবে চায়ের কেটলিটা নিয়ে প্লাটফরমে চ'লে যায়।

ভরতলাল পিটপিট ক'রে তাকায়। গলা নরম ক'রে বলে, বাবা, নোকরি করছিস তো দিমাগ ভি ঠিক রাখনা চাহিয়ে।

সুদাম জবাব দেয়, ওনার ভাবনা নাই পণ্ডিত, দিমাগটো আমার কিলিয়ার আছে বটে।

রোজই প্রায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই একই অনুযোগ আর একই জবাব। কথাটা ব'লেই প্লাটফরমের ওপর ছুটে চ'লে যায় সুদাম। ভরতলাল আপন মনে বিড়বিড় ক'রতে থাকে।

ক'দিন হ'ল অঘ্রাণ মাস প'ড়ে গেছে।

সুদামেরও কাজে ঢিলেমি বেড়েছে। ওদিকে বেড়েছে ভরতলালের দুশ্চিন্তা। প্রায় দু'মাস হ'ল মৌলবনী হ'য়েছে বোম্বে মেলের টি-হল্ট স্টেশন। দেখতে দেখতে ভরতলালের কারবার উঠেছে জাঁকিয়ে। ঠিক সকাল বেলা বিরাট অজগরের মতো বোম্বে মেলটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে মৌলবনীতে দাঁড়িয়ে পড়ে নিথর হ'য়ে। পনেরো মিনিট তার মেয়াদ। তারই ভেতর সারাদিনের কামাই উশুল ক'রে নেয় ভরতলাল। এ সময় সুদামের চ'লে যাওয়া মানে কারবারের বিস্তর ক্ষতি। ভরতলাল ভেবে রেখেছিল, বেশী পীড়াপীড়ি ক'রলে একটা টাকা মাইনে বাড়িয়ে অন্ততঃ আর মাসখানেক সুদামকে ধ'রে রাখবে। তারই মধ্যে দেখে নেবে অন্য লোক।

কিন্তু সেদিন পড়ন্ত দুপুরে হঠাৎ অকাল-বৃষ্টি নামায় ভরতলালের ফন্দী বানচাল হ'তে বসলো।

দুপুরের পরেই হঠাৎ আকাশ জুড়ে মেঘ। প্রথমে বৃষ্টি নামলো টিপটিপ করে। একটু পরেই খবর পেয়ে ছুটে এলো কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস। বৃষ্টি আর বাতাসের দাপট চললো ঘণ্টা দু'যেক ধ'রে। মোরাম স্তরের আড়ালে, পাথুরে মাটির বুকে তৃষ্ণার্ত ধরিত্রী তার লক্ষ জিহ্বা মেলে নিমেষে সব জল শুষে নিলে। মাটির ওপরটা শুধু একটু ভিজে ভিজে ভাব। বাতাসে শীতের শত ছুরির ফলা।

বিকেলের পার্শেল গাড়ীখানা ঘাটশিলার দিকে রওনা হ'য়ে গেল। খালি কেটলি হাতে দোকানে ফিরে এলো সুদাম। বিক্রির পয়সা বুঝিয়ে

দিয়ে বিনা ভূমিকায় বললে, আমি কাল সকালকেই ঘর যাবো পণ্ডিত।

ভরতলাল রীতিমতো চ'টে গেল। প্রচণ্ড রাগ কোনোমতে চেপে সে বললে, দু'চার রোজ বাদ যাবি।

নাই। আঘণে জল হ'ল। আর একটা পশলা হ'লে পাকা ধান ঝরি পড়বে সব।

তো হামরা কারবারকে নোক্‌সানি কোন্ দেখবে?

কেনে, তুমি দেখবে। সোদাম ছাড়া কারিগর নাই আর?

কাল আদমি কুথা পাবে? আদমি বন্‌বস্ত্‌ করবি তো তুহারাকে ছুট্টি মিলবে। নেহিতো ছুট্টি হোবে না।

ক্ষেপে গেল সুদাম। প্রতিবছর সে এসময় ছুটি নিয়ে থাকে। কেন ভরতলাল আগে থেকে লোক খোঁজেনি? একটা বিড়ি ধরিয়ে সে চড়া স্বরে বললে, আর আদমি বন্দোবস্ত না করি তো আমার জমিনের ধান ভুঁয়ে পড়ে পচুক। তমার কারিগরিতে আমি ইস্তফা দিলম পণ্ডিত—

হা হা ক'রে উঠলে ভরতলাল। এককথায় ইস্তফা! তার ইচ্ছে হচ্ছিল সুদামের গালে ঠাস্ ক'রে একটা চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু বিপদ তাতে আরও বেশী। সামলে নিলে নিজেকে। নিরুপায় ভাবে বললে, দিমাগ তো ঠাণ্ডা কর্ বাবা—

সুদামের ভ্রূক্ষেপও নেই। বললে, সোদাম বটে একটাই জবান বলে। আমার ইস্তফা পাকি কথা।

ভরতলাল বুঝলে এখন ঘাঁটাঘাঁটি করলে ঝামেলা বাড়বে। বললে, অচ্ছা তো ছুট্টি তুহারকে হোবে। লেকিন বাবা, কাল সুব্‌হ্‌কে মদ্রই মেল—

তাকে আর বলতে দিলে না সুদাম। ক'ষে বিড়িতে একটা টান দিয়ে একগাল হেসে বললে, তমার মেলগাড়ীটা পাস্ করাই দি যাবো বটে। ঝুটমুট দেরী করবো নাই। ধানটা কাটা হই গেল তো ফিরি আসবো।

ভরতলাল আর কথা বাড়ালে না। কিসে আবার কী হয়। পয়সা গুণতে গুণতে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলে। সুদাম বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

অন্ধকার আস্তে আস্তে দানা বাঁধতে সুরু করেছে। দূরে সিদ্ধাই পাহাড়ের উঁচু নীচু চূড়াগুলো আবছা দেখাচ্ছে। সমস্ত স্টেশনটা থমথমে। আর

সেই রাত এগারোটায় প্যাসেঞ্জার গাড়ী। ততক্ষণ পর্যন্ত স্টেশনটা পড়ে থাকবে মড়ার মতো।

প্লাটফর্ম্ ধ'রে পশ্চিমদিকে এগিয়ে চ'ললে সুদাম। ডাউন কেবিনের পাশ দিয়ে নেমে হাত পঞ্চাশেক গেলেই পুরনো ক্লাশফোর কোয়ার্টারের গুমটি ঘরের সারি। রায়বাবুকে ব'লে তার একটা ঘর চেয়ে নিয়েছিল সুদাম। সেখানে তার দু'একটা জামাকাপড় থাকে। একখানা চারপাইও নিয়ে রেখেছে ঘরে। দোকানে ব'সে মদ খাওয়ার অসুবিধে। হাতে সময় থাকলে মদ খেয়ে চারপাইটার ওপরে বসে মৌজ করে। নয়তো স্টেশনেই ফিরে যায়।

একে শীতকাল, তার ওপর অকালবৃষ্টি। এক ঢোঁক মদের জন্যে সুদামের মনটা অনেকক্ষণ থেকেই ছটফট করছিল। পার্শেল গাড়ীটা আধঘণ্টা দেরী ক'রে এসে তার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছে।

বেশ জোর পায়েই হাঁটছিল সুদাম।

হঠাৎ পেছন থেকে মেয়েগলার ডাক ভেসে এলো কানে। থম্‌কে থেমে পেছন ফিরে তাকালে সুদাম। চোখের পলক পড়া বন্ধ হ'য়ে গেল। পাথরকুচি ছড়ানো প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে মানী। একরাশ বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কায় সুদাম একেবারে অবাক হ'য়ে গেল।

মানী ততক্ষণ তার মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। তখনো সে হাঁপাচ্ছে। তারই ভেতর সুদাম দেখলে মানীর দু'টো ডাগর চোখ থেকে জমাট অভিমানের ধারা যেন ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে।

সুদাম বললে, ই সাঁঝ বেলাকে কুথা যাচ্ছিস ?

যিথানকে আমার মরণ হইছে সিথানকেই আ'লম। ব'লতে ব'লতে অভিমানে গলা ধ'রে এলো মানীর।—এতগুলা দিন কাটি গেল, একবার গিরামে গেলি নাই কেনে বল্ ?

একটু হেসে সুদাম বললে, কাল সকালকেই গিরামে যাচ্ছি। ছুটি লিলম তো আজই বটে।

মিছা কথা। তকে আমার বিশ্বাস নাই আর।

একেবারে বিশ্বাস নাই তর ?

হঁ। মরদকে বিশ্বাস যা'তে নাই।

অভিমানে টলমল ক'রছে মানীর দু'চোখ। সারাপথ ব্যগ্র উৎকণ্ঠার

মেয়ে [illegible] লোকটাকে যখন সত্যি সত্যিই সামনে পাওয়া গেছে তখন রাগ ক'রতে বাধা কী ?

সুদাম মুচকি হেসে বললে, কাল সকালকেই যাব। রঙ্কিনী মা'র কিরা—

আইরে বাপ! আঁৎকে উঠলে মানী।—উ কিরাটো বুলিস নাই রে সোদাম, আমি বিশ্বাস যাবো।

কোথায় গেল অভিমানের অশ্রু। আতংকে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল মানীর মুখ। সারা পরগণার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রঙ্কিনী। ছদ্মবেশে রঙ্কিনী মা একবার নদীর ঘাটে এক ধোপার কাছে একখানা শাড়ী চেয়েছিল। ধোপা দেয়নি। সেই রাগে দেবী তাকে পাথর ক'রে দিয়েছিল। বড়ো রাগ রঙ্কিনী মা'র। খুশি থাকলে সবাই থাকবে সুখে। রেগে গেলে আকাল মড়ক রোগ ভোগে দেশ যায় উজাড় হ'য়ে।

সুদাম মিট মিট ক'রে হাসছিল।

মানী করুণ গলায় বললে, তর ছাতিতে ডর নাই সোদাম?

কেনে থাকবে নাই? মিছা তো বলি নাই তকে।

মানী কয়েকমুহূর্ত চুপ ক'রে রইলে। সুদামও অপলক তাকিয়ে আছে তার দিকে। মানীকে দেখে দেখে আশা মেটে না। ওই বাড়বাড়ন্ত যৌবন, ওই চাউনি, ওই বুকভরা ভালোবাসা তাকেই সঁপে দিয়েছে মেয়েটা।

কী দেখছিস বটে? ফিক্ ক'রে একটু হেসে মানী বললে।

চমক ভাঙলো সুদামের। বললে, দেখছি তকে। তারপর একটু মুচকি হেসে গলা নামিয়ে বললে,

ছুটু ছুটু গাছগুলিন্
কতই যতন করবো।
তুই রমণী চিন্তামণি
তকেই বিহা করবো।

আর একবার ভয়ে শুকিয়ে গেল মানীর মুখ। পরবের সময় ছাড়া টুসুর গান মুখে আনাও যে পাপ! টুসু তাতে রেগে যায়। সারা গায়ে খোস পাঁচড়ায় তার শাস্তি।

তীব্র অভিমানে মানী বললে, করালী সদ্দারের নাতি আছিস বলি কনো নিয়মটাই কি মানাগণা নাই তর্?

সুদামের মানিগণ্যি থাক না থাক তার হয়ে মানীই কয়েকবার কপালে হাত ঠেকিয়ে টুসুর উদ্দেশ্যে বিড়বিড় ক'রে কী বললে।

মজা পেয়ে সুদাম বললে, ডর হ'ল তর ?

নাই। ঝাঁঝের সঙ্গে বললে মানী।

একটু দূরেই স্টার্টার সিগ্‌ন্যালের আলো জ্ব'লে উঠলো। আবছা অন্ধকারের কপালে দু'টো ভাঁটার মতো চোখ।

ব্যস্ত হ'য়ে পড়লে মানী। অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে। মামাবাড়ীতে যাওয়ার ছলে সুদামের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবার ফন্দীটা তারই। মামা আছে সঙ্গে। স্টেশনঘরের ওপাশে বেঞ্চির ওপর ব'সে আছে লোকটা। জলতেষ্টার নাম ক'রে মানী এসেছে অনেক ঝুঁকি নিয়ে।

সময় খুব কম। এদিক ওদিক তাকিয়ে মানী বললে, বাপে আমার বিয়ার কথা ক'রছে, সিটা জানাই দিলম তকে। মামাটো বসি আছে উধারকে। যাই—

মুহূর্তে সুদামের মুখের ভাব পালটে গেল। ব্যস্ত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলে, মরদ কুথাকার বটে ?

জানি নাই। নিস্পৃহ জবাব দিলে মানী।—সিটাকে আমার কি কাজ ?

সুদামের কপাল কুঁচকে গেল। বললে, আন মরদে তকে লিই ঘর করতে পারবে নাই।

মানীর মুখে ফুটে উঠলো পরিতৃপ্তির হাসি। তবু নারীর চিরকালে ছলাকলার স্বভাব। বললে, বিয়া দিয়া দিলে সি আনমরদেরই ঘর করবো বটে।

সুদাম কী যেন বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই মানী বললে, কাল ঘরকে যাচ্ছিস, কাল দেখা হবে। আখুন যাই।

কথাটা ব'লে সে আর অপেক্ষা করলে না। দেরী হ'লে যদি ধরা পড়ে যায় !

অনিচ্ছুক বিদায়ের বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে সে রওনা দিলে। যেমন দ্রুত পায়ে এসেছিল, তেমনি ভাবেই চ'লে গেল। পাথরকুচির ওপর ঝম্ ঝম্ শব্দ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল।

বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইলো সুদাম। কয়েক লহমার দেখা। কিন্তু যে খবরটা মানী দিয়ে গেল সেটা খুব সহজে নেবার নয়। ধান কাটার

[illegible] যদিও বা দু'দিন দেরী করা যেতে পারতো, কিন্তু এরপর আর একটা দিনও দেরী করা চলে না এখানে।

তীরের ফলার মতো গায়ে এসে বিঁধছে কন্‌কনে বাতাস। এখন চাই মদ। চিন্তার সময় পরে পাওয়া যাবে।

ডাউনকেবিনের দিকে পা চালিয়ে দিলে সুদাম। আগের চেয়ে আরও জোরে।

পরদিন সকালের দায়িত্ব চুকিয়ে দিয়ে কুশমণ্ডলের পথে বেরিয়ে পড়লে সুদাম। হন্‌-হন্‌ করে এগিয়ে চ'ললে উঁচু-নীচু পাথুরে রাস্তার ওপর দিয়ে। সকালের রোদে তখনো ঝাঁজ লাগেনি। উঠোনে দাঁড়িয়ে মানদা কী একটা কাজ করছিল। ছেলেকে আসতে দেখেই কাজ ফেলে ছুটলে রাস্তার দিকে। তার ব্যস্ত পায়ের ধাক্কা খেয়ে দু'টো নিরপরাধ মুরগী কক্‌ কক্‌ ক'রতে ক'রতে ছুটে পালিয়ে গেল।

আনন্দে অভিমানে মানদা একেবারে দিশেহারা হ'য়ে পড়েছে। বারবার ক'রে সুদামের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব'ললে, ঘরের কথা তর মন পড়ল সোদাম? বুড়া মা-বাপকে ভুলিস নাই রে?

একথা শুনে শুনে সুদামের অভ্যাস হ'য়ে গেছে। হেসে বললে, তর্‌ খালি এককথা। সকাল থেকা রাত শেষপ'র তক কাজ। কখন আসি বল্‌?

মানদার মন মানতে চায় না, তবু মানিয়ে নিতে হয়। গভীর দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলে ডাগর হ'য়েছে। বাড়ীর টান থাকবে কিসে?......বহুদিন আগের কথা আবছা ভাবে মনে পড়ে। বছর দশেক বয়সে জটাধর সর্দারের বউ হ'য়ে এই বাড়ীতে পা দিয়েছিল মানদা। জটাধরের চেহারাও তখন ছিল অনেকটা সুদামেরই মতো। এখন দেখলে চেনাও যাবে না। মদে আর মেহনতে দড়ি পাকিয়ে গেছে লোকটার দেহ।

মানদা একটু হেসে বললে, ইবার তর কুনো কথা আমি শুনবো নাই বটে। ঘরকে বউ আনতে সাধ যেছে আমার।

সুদাম মিটমিট ক'রে হাসতে লাগল।

চ'টে গেল মানদা। বললে, হাসির বটে কথাটো ?

বিয়া করাবি তো মেয়্যা কুথা ? আমার পছন্দী মেয়্যা তর ভূমজ ঘরকে নাই।

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালে মানদা। বুক যেন কেঁপেও উঠ্‌লো একটু। ভূমিজ ঘরে এত মেয়ে থাকতে যদি মেয়ে না থাকে, তবে সেই পছন্দসই মেয়ে কোথায় ? একপুরুষ বাদে আবার কি সেই অশান্তির মেঘ আড়ালে জ'মেছে ?

সভয়ে মানদা বললে, তর মনকে কী আছে বল্ বাপ। আমার বুক কাঁপে।

কেনে ? ভয়টো হবে কেনে ?

ই ঘরের ধারা ভালো নাই। তাই ভয় হ'ল আমার।

খানিকটা হেসে সেখানেই কথা চাপা দিয়ে দিলে সুদাম। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, বুড়োটা কুথা গেইঁছে ?

মানদা একেবারে অবাক হ'য়ে গেল।—কেনে, জানিস নাই কুথা ? মানুষটো গিধনিকে যাবে বলি সেদিন বেরাইঁ গেল তো। তোর সঙ্গে দিখা করে নাই ?

উহুঁ। সুদামও বিস্মিত হ'য়ে বললে, আমি তো টিশনকেই ছিলাম। গিধনিকে আখন কোন কামটো বটে ? ধান কাটা ক'রবে নাই ?

মানদা ঝাঁজের সঙ্গে বললে, উটা আ'লে উটাকেই পুছাস।

সুদাম বললে, কবে ফিরবে ?

জানি নাই।

বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিয়ে ঘরে চ'লে গেল মানদা।

সুদাম একটা বিড়ি ধরিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলে। জটাধর আসুক না আসুক পরের দিন থেকে তাকে জমিতে নামতে হবে। আজকের দিনটা পুরোপুরি ছুটি। মানীর সঙ্গে আজ কথা বলে নিতে হবে প্রাণ ভ'রে।

সারা সকালটা মানীর যে কীভাবে কেটেছে তা শুধু সে-ই জানে। তবু সকাল গড়িয়ে একসময় দুপুর হ'ল।

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মানী। নেমে পড়লে উঠোনে।

সামনের কেঁদকরমের ছোট জংগলটার ওপর দিয়ে পুবদিকে চট্ ক'রে একবার তাকাতেই তার বুকের ভেতর ছলাৎ ক'রে উঠলো। রকন ডুংরির মাথায় বনতুলসীর ঝোপের পাশে সুদামকে দেখা যাচ্ছে। কতক্ষণ এসে ব'সে আছে কে জানে!

উঠোনের ওপাশে পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে পোষা ছাগল দু'টো ঘুমোচ্ছিল। অন্যদিন এসময় নিজেরাই ডুংরির ধারে চ'রে বেড়ায়। আজ মানীর যাবার দরকার আছে ব'লেই বোধহয় ষড়যন্ত্র ক'রে উঠোনে প'ড়ে ঘুমোচ্ছে। রাগ হ'য়ে গেল মানীর। ছাগল দু'টো নিজেদের অপরাধ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। হঠাৎ তাড়া খেয়ে তারা উঠোন পেরিয়ে ছুট দিলে। সঙ্গে সঙ্গে মানীও ছুটলে।

বাগালপাড়া থেকে রকন ডুংরি পাঁচ মিনিটের পথ। কেঁদ-করমের জংগলটা পার হ'লেই ফাঁকা এক টুকরো মাঠ। মুগরো ঝোপের পাশে পাশে আঁকা-বাঁকা পথটা গিযে মিশেছে ডুংরির গায়ে। ছোট একটা টিলা। তারই নাম রকন ডুংরি। রুক্ষ তামাটে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বনতুলসী আর ঘাসের চাপড়াগুলো রসের অভাবে শুকিয়ে বিবর্ণ হ'যে গেছে। ডুংরির ঠিক নীচেই একটা পুকুর। লোকে বলে বাঁধ। প্রান্তরব্যাপী বিবর্ণতার ভেতরে ওই বাঁধের গাযে তবু সারা বছর একটু ঘাসের সবুজ নজরে পড়ে।

দুপুরের রোদ পশ্চিমে একটু হেলতেই সুদাম ডুংরির মাথায় উঠে প্রায রুদ্ধশ্বাসে বাগাল পাড়ার দিকে তাকিযে ব'সে ছিল।

কুশমগুলের বিরাট প্রান্তরটা ছবির মতো চোখের সামনে ভাসছে। জমিতে জমিতে পাকাধানের সোনালি আভায় চোখ যেন ঝলসে যায়। বাঁধের ঠিক গায়ে দু'খানা বড়ো জমি করালী সর্দারের নিজের হাতে কেনা। এবছর ফসল যেন আরও বেশী হ'যেছে।

সুদাম একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল।

হঠাৎ নীচে বাঁধের দিকে চোখ পড়তেই তার চোখের পলক থেমে গেল। দু'টো ছাগলকে তাড়া ক'রতে ক'রতে মানী একরকম ছুটেই আসছে। মনের মতো ক'রে সেজেছে আজ। সুদাম লাল শাড়ী পছন্দ করে। মানীর পরনের লাল শাড়ী থেকে যেন রঙের আগুন ছুটছে। মেয়েটা এগোচ্ছে আর চোখ তুলে তুলে তাকাচ্ছে। সুদামের মুখে ফুটে উঠলো হাসি। টুপ ক'রে নেমে গিয়ে বসলে একটা বড়ো পাথরের চাঁইযের ওপর।

একটু পরেই দেখা গেল মানীকে। ছাগলটাকে এতক্ষণে ছেড়ে দিয়ে তরতর ক'রে সে উঠে এসে ধুপ ক'রে-ব'সে পড়লে পাথরের ওপর। মুখ টিপে হেসে বললে, কার লেগা ভুংরিকে ব'সি আছিস রে?

সুদাম বললে, পাহাড়ী চিতি একটা ধরবো মন লিছে।

ফিক ক'রে একটু হেসে মানী বললে, তবে থাক, আমি যাই। ছাগলটো হারাইঁ গেল, উটাকে তলাস করবো।

থপ্ ক'রে মানীর একখানা হাত ধ'রে কাছে টেনে নিলে সুদাম। গম্ভীর স্বরে বললে, কাজের কথা বল্। তর বিয়ার কথা কী সব হইছে, বল সিটা।

সঙ্গে সঙ্গে মানীর মুখ থেকে রহস্যের উচ্ছলতাটুকু মিলিয়ে গেল। সুদামের দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, বাপ আর মামা কথা করছিল বটে। সব কথা আমি জানি নাই।

সুদামের চোখে খেলে গেল এক কঠিন আক্রোশের চকিত-তরঙ্গ। বললে, আমার মনের মেয়্যা তু। তকে আমি ভিন্ মরদের ঘর ক'রতে দিবো নাই মানী।

মানী নির্লিপ্তস্বরে বললে, আন্‌মরদের কাছকে বিয়া বসছে কে? তুই তো বটে আমার মরদ।

আবেশে সুদামের কোলে মাথা রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলে মানী। এমন নিশ্চিন্ত নির্ভর থাকতে তার অনর্থক চিন্তা করবার কিছু যেন নেই।

সুদাম কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে তারপর বললে, দরকার পড়লে সিন্দুর-ঘষা করি দিব—

কথাটা শেষও হ'ল না। তড়াক ক'রে উঠে বসলে মানী। নিমেষের মধ্যে তার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে। বিবর্ণ পাংশু মুখে সে অস্ফুটকণ্ঠে বললে, সিন্দুর-ঘষা!

হঁ, তর বাপ দিমাগ দেখায় তো তাই করবো।

মানী বিহ্বলের মতো কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলে সুদামের দিকে। তারপর ধরা গলায় বললে, তর পায়ে পড়ি সোদাম, আর যা বলবি বাদ সাধবো নাই—সিন্দুর-ঘষা তু করিস নাই। লোকে থুক দিবে আমাকে, তর মেয়্যা-মানুষ বলবে আমাকে। সিটা আমি শুনতে পারবো নাই রে।

সুদাম থতমত খেয়ে গেল। মানীর শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা ক'রে বললে, একটা কিছু না করলে তকে পাবো কেমন করি, সি কথাটো বল্।

পাবি। স্তিমিত গলায় মানী বললে, আমার সব তকে দিছি সোদাম। পালাই চল্—যাবো, দিনভর মিহনৎ করতে বল—করবো। ই গিরামে লোকের থুক লিয়ে আমি থাকতে লারবো।

তার ম্লান চোখে করুণ অনুনয় যেন ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে। তার সবচেয়ে বড়ো নির্ভর যে লোকটা, সে কি তাকে এমন অসম্ভ্রমের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে?

সুদাম কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর নরম-স্বরে বললে, পালাই যাব কুথা বল? কি খিয়াবো তকে?

কেনে, ঝাড়গ্রাম গিধনি—যেথাকে খুশি চল। সি মাসকে যে বললি, শাল জংগলের কাজে অনেক লোক লিছে?

সুদাম একটু দ'মে গেল। কয়েক মাস আগে একদিন উচ্ছ্বাসের আবেগে গিধনির নতুন শাল-জংগল পত্তনীর কথা সে নিজেই বলেছিল মানীকে। দরকার হ'লে দু'জনে সেখানে চ'লে যাবে এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। সে ভুলে গেলেও মানী কথাটা ভোলেনি।

মানী নতুন আগ্রহে আবার প্রশ্ন করলে, কী ভাবছিস, পালাই যাবি?

সুদাম বললে, কিন্তুক আমার জমিন?

জমিন লিই থাকুক তর বাপ। আমরা ইথানকে থাক্‌ব নাই।

সুদাম বললে, তা হয় না।

মানীর চোখ মুখের ভাব নিমেষে পালটে গেল। ঘাড় বেঁকিয়ে প্রশ্ন করলে, কেনে?

মানীর সে দৃষ্টির সামনে সুদাম কেমন একটু হকচকিয়ে গেল। বললে, কোনো ভয় নাই তর। ঘরের বউ করি রাখবো তকে।

ম্লান-স্বরে মানী বললে, গাঁওলা-পঞ্চ মানবে তর কথা?

মানতে হবে। করালি সর্দারের নাতি বটি আমি।

মানী একেবারে ভেঙ্গে পড়লে। চোখ দু'টো টলমল করে উঠলো তার। ধরা গলায় বললে, তুর যদি এটাই মন ছিল, তবে কেনে আমার মন কাড়লি রে সোদাম!

মানীকে কাছে টেনে নিলে সুদাম। বললে, বাগাল ধরেই বা আমি কেনে জনম লিখম নাই তাও বল্—

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল, কারও মুখে কোনো কথা নেই।

সুদামের মনে ঝড় উঠতে সুরু করেছে। একদিকে মাটি, একদিকে মানী।

দূরে শাল-মহুয়ার জংগলের ভেতর থেকে রাকা মাইন্‌স্-এর উঁচু চিম্‌নিটা উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে সূর্য তখন প্রায় ডুবতে বসেছে।

সুদাম হঠাৎ কী ভাবলে সে-ই জানে। নিবিড় মমতায় মানীকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললে, তর মুখ আমি রাখবো মানী। ধান কাটার ই কটা দিন যাক, তারপর সব কথা।

মানী বড়ো বড়ো চোখ মেলে তাকালে। অরণ্য প্রকৃতির আপন হাতে গড়া মেয়ে। আপন প্রাপ্য বুঝে নেবার মুহূর্তে সে আদিম। শক্ত ক'রে সুদামের হাত চেপে ধ'রে বললে, ইথান থাকতে পালাইঁ যাবি বল্—

সুদাম জবাব দিলে না। কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মানীর দিকে।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালে মানী। সুদামের দিকে তাকিয়ে বললে, তু নামেই মরদ, কাজে নাই।

খপ্‌ করে তার হাত ধরে সুদাম বললে, করালী সর্দারের নাতি মরদই, আছে। তকে আন্‌মরদের ঘরকে আমি যা'তে দিবো নাই জানি রাখ্‌।

সুদামের চোখ দু'টো জ্বলে উঠেছিল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে মন্ত্রমুগ্ধ নাগিনীর মতো ফণা নীচু ক'রে গভীর আবেগে মানী বললে, তু আমাকে বড়ো দুখ্‌ দিস সোদাম। কেনে দুখ্‌ দিস? কেনে—

মানীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সুদাম বললে, আর দুখ্‌ দিবো নাই রে।

মানীর মুখে এতক্ষণে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠ্‌লো। আস্তে নিজেকে সুদামের আলিঙ্গন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আর দেরী ক'রলে ধরা পড়ি যাবো।

এক ঝলক মিষ্টি হাসি হেসে সে তরতর ক'রে নামতে লাগলো। সুদাম দাঁড়িয়ে রইলে বিহ্বলের মতো। কোন্‌ আশ্বাস সে দিলে তা হয়তো নিজেই বুঝতে পারছিলো না।

ছাগল নিয়ে মানী কেঁদকয়মের জংগলের ভেতর মিলিয়ে গেল। একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে ডুংরি থেকে নেমে বাড়ীর পথে পা বাড়ালে সুদাম।

সেই দিনই গিধনি থেকে ফিরে এলো জটাধর।

তিনটে বিশের প্যাসেঞ্জার গাড়ী থেকে মৌলবনীতে নেমে সুদামের খোঁজও করেনি। কুশমণ্ডলে পৌঁছে অসময়ে একপেট মদ খেয়ে যখন সে বাড়ীতে ফিরলে, সুদাম তখন ডুংরির মাথায়।

জটাধরের তখন সবে নেশা জমে আসছে। দাওয়ায় ব'সে কিছুক্ষণ পিটপিট ক'রে তাকালে। মানদা দু'চারবার সামনে দিয়ে চ'লে গেল, একবার প্রশ্নও ক'রলে না কিছু। জটাধরের তাতে আপত্তি নেই। নেশার ঝোঁকে খোস-মেজাজে সে নিজেই কথা বললে।

সোদামের মাকে বড়ো সোন্দর দিখাইছে বটে!

মুখ-ঝাম্‌টা দিয়ে মানদা ব'ললে, মরণ হয় নাই তর?

হা হা ক'রে হেসে উঠলে জটাধর। বললে, হঁ, মরণ আমার হ'ল বটে। জিলাপি লিয়ায়, মুড়ি লিয়ায় যা—। তিনখান জমি বন্ধক করি অনেক ট্যাকা হ'ল আমার—।

মানদা অস্ফুট স্বরে কী একটা ব'লে ঘরে চ'লে গেল। আরও জোরে হেসে উঠলে জটাধর। বেসুরো গলায় একটা ঝুমুর গানের কলি ভাঁজতে সুরু ক'রলে,—

হায় হায় এ কি বিষম দায়।
নারী না হয় আপন
যতই তারে যতন করো হায়—এ—এ॥

জটাধর প্রাণের আবেগে সুর ভাঁজছিল। সেই সময়ই উঠোনে এসে দাঁড়ালে সুদাম। জটাধরের মাথাটা ঢুলে ঢুলে প'ড়ছে। চোখ জড়িয়ে আসছে। তবু তারই ভেতর সুদামের পায়ের শব্দ শুনে ঢুলু ঢুলু চোখ তোলার চেষ্টা ক'রলে জটাধর। টেনে টেনে ব'ললে, কে আ'লি বটে?

আমি, সোদাম বটি।

হা হা ক'রে খানিকটা হেসে উঠলে জটাধর। তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে

বললে, তু বটিস্ সোদাম, আর আমি বটি জটাধর সদ্দার, হুঁ। আমি জটাধর হে-এ-এ—

বেসুরো গলায় আর একটা টান দিয়ে আবার হা হা ক'রে হেসে উঠ্‌লো জটাধর।

সুদাম বিরক্ত স্বরে বললে, খুব কষি হেঁইড়ে খাইঁছিস?

অঁ? চোখ তুলে তাকালে জটাধর।—হুঁ, খা'লম বটে। খা'লম আমার আপন পয়সায়। তর বাপের পয়সায় নাই খাইঁছি।

এই সময় ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মানদা। আষাঢ়ের আকাশের মতো থমথমে মুখ। দাওয়ায় নেমেই সে অসহ্য রাগে ফেটে প'ড়লে। এতক্ষণের নিরুদ্ধ আক্রোশ ছুটে বেরিয়ে এলো বাঁধভাঙ্গা বানের জলের মতো।

থাম্ বুড়া। কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে ধমক দিলে মানদা।

জটাধর বিশেষ ভয় পেলে না। নেশার মৌতাতে সে তখন অন্য জগতে। নির্লিপ্ত গলায় বললে, কেনে থামবো? আমার মন খুশী রইছে, আমি গান বুল্‌ব-অ-।

মন তর খুশী বটে? খুশী? বল্‌তে বল্‌তে অসহ্য আক্রোশে জটাধরের পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে নিজের কপাল চাপড়াতে লাগলো মানদা। আর সেই সঙ্গে হাউমাউ ক'রে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলো কথা ব'লে গেল।

হায় হায় রে, কী আমার হল রে! বুড়া ভামটা মরিপুড়ি গেল নাই কেনে রে—।

থতমত খেয়ে গেল সুদাম। মদ খাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তা নিয়ে এত হাহুতাশ করবার তো কোনো হেতু নেই!

সে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লে মানদা।—আমার সব্বনাশ হই গেইছেঁরে সোদাম। তিনখান জমি বন্ধক করি উড়াই দিছেঁ বুড়াটা। হায় হায় রে—

সুদাম কিছুক্ষণের জন্যে যেন বোবা হ'য়ে গেল। চোখের সামনে সব কিছু যেন ঝাপসা লাগছে।

মানদা তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌লে, কেনে বন্ধক করেঁছিস বল?

জটাধর আগের মতোই নির্লিপ্ত। মানদার উত্তেজনা তাকে কিছুমাত্র বিচলিত করেনি। টেনে টেনে ব'ল্‌লে, লাচুনি লাচের দল খুলবো বটে। ট্যাকা লাগ্‌বে নাই?

কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত।

তারপরই সুদামের মুখের ভাব পালটে গেল।

তার দিকে তাকিয়ে মানদারও বুক শুকিয়ে গেল। কেরোসিনের ডেমির ক্ষীণ আলোর শিখা প'ড়েছে সুদামের মুখে। আলো কাঁপছে! আর সেই কাঁপা আলোর ভেতর সুদামের চোখ দু'টো জ্বলে উঠেছে বাঘের মতো। দাঁতে দাঁত চেপে সে তাকিয়ে আছে জটাধরের দিকে। মার-খাওয়া বাঘ যেমন জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ ক'রে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি তার ভঙ্গী।

প্রচণ্ড ভয়ে শুক্‌নো গলায় মানদা চেঁচিয়ে উঠ্‌লে, সোদাম!

সুদাম মায়ের দিকে একবার তাকিয়েই এক লাফে ঝাঁপিয়ে প'ড়লে জটাধরের ওপর। পাগলের মতো লোকটার অশক্ত দেহে ঝাঁকুনি দিতে দিতে হুংকার দিয়ে বল্‌লে, কেনে জমিন বন্ধকী ক'রেঁছিস্ বল্?

এতক্ষণে জটাধর একটু ভয় পেয়েছে। তবু করালী সর্দারের সাক্ষাৎ রক্ত তার শিরায় শিরায়। টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌লে, আমার জমিন্— আমি যা মন চাই ক'র্‌বো। বন্ধক ক'র্‌বো, বেচা ক'র্‌বো, বিলাইঁ দিবো— আমার খুশি, হুঁ।

ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রতে গিয়ে ট'লে পড়ে গেল জটাধর। হিংস্র পশুর মতো সুদাম আবার ঝাঁপিয়ে প'ড়তে যাচ্ছিল, তার আগেই মানদা মরীয়ার মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়লে দু'জনের মাঝখানে। চীৎকার ক'রে পাড়াপড়শীদের ডাকতে সুরু ক'রে দিলে সে।

সুদাম ছেড়ে দিলে জটাধরকে। সঙ্গে সঙ্গে কী এক প্রচণ্ড অবসাদে অবশ হ'য়ে গেল তার দেহটা। জটাধর মাটিতে পড়ে অজস্র অকথ্য গালিগালাজ দিয়ে চ'লেছে। সেই সঙ্গে সমানে চেঁচাচ্ছে মানদা।

মর্, মর্ তু। হাড় জুড়াইঁ যাক আমার। আপদবালাই মর্—

সুদাম আর একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জটাধরের দিকে তাকিয়ে আচ্ছন্নের মতো টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে গেল। বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল তার কালো দেহটা।

নাচুনী নাচের দল মানে ঝুমুর-দল।

একটি নাচুনী মেয়েকে কেন্দ্র ক'রে অলক্ষ্মী-সাধনার সর্বনাশা সাধ! চঞ্চলা লক্ষ্মীকে রুষ্ট করবার সেই বাঁধাধরা পথে পা দিয়েছে জটাধর সর্দার।

এর ইতিহাস অনেক পুরনো। ভুঁইঞা আর ভূমিজের এই অলক্ষ্মী সাধনার সূত্রপাত হয়তো একশো বছর আগে। কিম্বা তারও বেশী।

কয়েক পুরুষ আগের কথা।

তখন ভুঁইঞারা ছিল জমিদার। ভূমিজেরাও কিছু কমতি নয়। চারিধারে পাহাড়ে-ঘেরা এই সমতল ভূমিতে সবটুকু মাটির মালিকানা ছিল তাদের দখলে। কিন্তু মদের উগ্র আকর্ষণ আর প্রবৃত্তির দুর্নিবার আগুনে পুড়তে লাগলো ভবিষ্যৎ। তবু চেতনা নেই। হাড়িয়ার স্রোত আর ঝুমুর নাচের তালে তালে বেসামাল বেপরোয়া মানুষগুলি দিশেহারা হ'য়ে গেল। তার সঙ্গে আছে জুয়া আর মোরগ-লড়াইয়ের নেশা। নগদ টাকা নেই অথচ টাকা চাই। টান প'ড়লো জমিজমায়। জলের দরে বিকিয়ে যেতে লাগলো জমির পর জমি। কখনো বা মনকে বুঝ দেবার জন্যে বিক্রীর বদলে বন্ধকী। কিন্তু যে জমি একবার বন্ধক পড়েছে তা আর কোনোদিনই ফিরে আসেনি। একহাত থেকে অন্য হাত। এক চুক্তি থেকে অন্য চুক্তি। ওৎ পেতে ছিল ক্রেতার দল। দু'হাতে টাকা ছড়িয়ে তারা জমি বন্ধক নিয়েছে। মুঠো মুঠো টাকা ফেলে নাচের দল আর জুয়ায় দাদন দিয়েছে। অন্নদাত্রী লক্ষ্মী গিয়ে বন্দী হ'য়েছেন তাদের গোলায় আর সিন্দুকে।

মাত্র কয়েক পুরুষের ব্যাপার।

তারপরই চমক ভেঙেছে ভুঁইঞার, ভূমিজের।

কিন্তু তখন ভূম্যধিকারী পরিণত হ'য়েছে ভূমিদাসে। যে কপাল সেলাম পেত সেই কপালেই সেলাম ঠোকার দিন তখন।

তাদেরই রক্ত জটাধর সর্দারের দেহে। সেই রক্তে সর্ব্বনাশের মাতন আবার নতুন ক'রে এসেছে। তার পেছনেও আছে ছোট্ট একটি কাহিনী।

প্রতিবারের মতো এ বছরও পূজোর সময় ঝুমুরের আসর হ'য়েছিল

যৌলবনীতে। তিন রাত পরে নাচ গান শেষ হল, আসরও ভেঙে গেল, কিন্তু জটাধরের মন থেকে তার জের মিটলো না।

এবারে এসেছিল গিধনির রাজু অধিকারীর দল। দশ-বিশ মাইলের ভেতর সেরা নাচুনী পিয়ালি তার দলে। বায়নার পর বায়না। সামাল দিতে হিম-সিম খেয়ে যাচ্ছে রাজু। সবই পিয়ালির জন্যে। পিয়ালি রূপবতী। তার চোখে বিজলীর ঝলক, হাসিতে সম্মোহনের মদিরা। নাচে গায়ও ভালো। অত রূপসী মেয়ে ঝুমুর দলে সব সময় মেলে না। রূপের আগুন জ্বললো জটাধরের মনে। পিয়ালির গানের কলি লেগে রইলো কানে। কেমন একটা নেশায় আচ্ছন্নের মতো সারাটা রাত তার কেটে গেল স্টেশনের বেঞ্চে শুয়ে।

পরের দিন সকালে।

ঝুমুরের দল রওনা হবার আগে গোছগাছ ক'রছিল।

গুটি-গুটি সেদিকে এগিয়ে গেল জটাধর। পিয়ালিকে আর একবার দেখতে হবে। সে রাজী হ'লে 'হায়-হায় একি বিষম দায়' গানটাও আর একবার শুনতে হবে।

ডেরা পর্যন্ত যেতে হল না। তার কিছু আগেই ইঁদারার ধারে পাওয়া গেল পিয়ালিকে।

মনে মনে অনেক কথার জাল বুনেছিল জটাধর। কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে মুখোমুখি হতেই সব কথা কেমন জট পাকিয়ে গেল। বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলে সে।

আগের রাতের ক্লান্তি আর নেশার অবসাদ তখনো একটু একটু লেগে আছে পিয়ালির কাজল-টানা চোখে। জরির ফিতে দিয়ে বাঁধা বিনুনির বাঁধন অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে। রুক্ষ চুলের সরু সরু গোছা ছড়িয়ে পড়েছে কপালে।

জটাধরকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখেও প্রথমটা পিয়ালি কিছু গ্রাহ্য করেনি। তাকে দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অনেকেই তাকায়। সেটুকু তার প্রাপ্য বলেই সে জানে। পরিতৃপ্তির আনন্দে সে নিজেই ভ্রূকুটি ক'রে তাকালে একবার জটাধরের দিকে।

তাচ্ছিল্যের চাউনি। তবু লোকটা নড়ে না।

একটু করুণার হাসি হেসে পিয়ালি বললে, কী দেখছ গো?

তমাকে দেখছি বটে। কৃতার্থ হয়ে ব'ললে জটাধর।

কেনে, কাল রাতকে আসরে দেখলে নাই?

দেখলম। কিন্তুক আশ পুরে নাই গো। ব'ললে জটাধর। তমার নাচ বলো, গান বলো—আমাকে উচাটন করি দিঁছে নাচনী।

চোখ পাকিয়ে মুচকি হেসে পিয়ালি বললে, বটে? তবে তো বড়ো দায় হল!

ততক্ষণে জটাধরের বিহ্বল ভাবটুকু কেটে গেছে। লোলুপ-দৃষ্টিতে পিয়ালির অবস্ত্র-আবৃত যৌবনপুষ্ট দেহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঝিম্ ধরে যাচ্ছে মাথায়। বললে, আজ সকালের পাসিঞ্জার ধরেই তো ফিরছ?

হঁ, ফিরবো। তমাদের বায়না তো খতম্ হই গেল।

চেপে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে জটাধর। তারপর উৎসুক-দৃষ্টি মেলে বললে, তমার একটা গান আমার বড়ো মন কাড়ি লিইঁছে নাচনী। একবার বুলবে গানটো?

অবাক হ'য়ে তাকালে পিয়ালি। আখন গান বুলবো কেনে?

বুললেই বা। সাগ্রহে আর এক পা এগিয়ে গেল জটাধর।

পিয়ালি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলে জটাধরের মুখের দিকে। লালসা মাখা দৃষ্টি তার অতি-পরিচিত। জটাধরের চোখেও সেই দৃষ্টি। ফিক্ ক'রে একটু হেসে সে বললে, আসর ছাড়ি নিরিবিলি গান শুনতে চাও তো ট্যাকা লাগবে গো।

জটাধর সঙ্গে সঙ্গে বললে, কত ট্যাকা চাও?

হাতের পাতা মেলে ঘাড় বেঁকিয়ে আড় চোখে তাকালে পিয়ালি।

পাঁচ টাকা!

একটা গানের এত দাম!

মরীয়া হয়ে গেল জটাধর। সঙ্গে ছিল কিছু টাকা। দ্রুত হাতে গেঁজে খুলে ইঁদারার শান-বাঁধানো পাড়ের ওপর ছুঁড়ে দিলে একখানা পাঁচ টাকার নোট। বাতাসে একটু উড়ে গিয়ে ঘাসের ডগায় বেধে কাঁপতে লাগলো নোটখানা।

বিস্মিত চোখে বারকয়েক তাকালে পিয়ালি। একবার টাকার দিকে, একবার জটাধরের মুখের দিকে। ব্যাপারটা এতদূর গড়াতে পারে তা হয়তো সে ভাবেনি। জটাধরের ওষ্ঠে ফুটে উঠ্‌লো বিজয়ীর মৃদু হাসি।

কিন্তু পিয়ালির হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। পিয়ালি নাচুনীর অনেক কদর। তার নামে দশবিশ গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ে ঝুমুরের আসরে। একটা উট্‌কো লোক পাঁচটা টাকার গরম দেখিয়ে তাকে নাকাল ক'রে যাবে?

উঠে দাঁড়ালে পিয়ালি। ভিজে হাত শাড়ীর আঁচলে মুছে এক ঝটকায় বিনুনিটা পিঠের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে ব'ললে, ট্যাকা তমার উঠাই লিই যাও। গান শুনার সাধ থাকে তো দল খুলে নাচনী পুষে ঘরকে বসি শুনো। পারবে?

জটাধরও এগিয়ে এলো। ব'ললে, ই কথা বটে তমার?

হঁ। ই আমার কথা। জবাব দিলে পিয়ালি।

খুলবো দল। তুমি আসবে কথা দাও।

নাম কি তমার?

জটাধর সদ্দার। করালী সদ্দারের বেটা বটি। আমার জবান খিলাপি নাই।

পিয়ালি আর একবার গভীর সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে জটাধরের দিকে। রোখ আছে বটে লোকটার। দল খুলুক না খুলুক—পরের কথা। পিয়ালিও হারবার মেয়ে নয়। ঘাড় কাৎ করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, খোরপোষ বলো, গহনা বলো—দিতে পারবে? শখ-শখিনতা পোষাতে পারবে?

কথার খিলাপি জটা সদ্দারের নাই তা জানো নাচনী। কত শখ-শখিনতা তমার? চাঁদিতে চামড়া মুড়ি দিব। আমার দলকে আসবে কিনা জবান দাও।

পিয়ালি এক মুহূর্ত কী ভাবলে। তারপর বললে, ট্যাকার জোগাড় করি গিধনিকে দেখা ক'রো। তমার মুরাদ বুঝি আগে, পরে আর সব কথা।

আচ্ছা, এক মাসের ভিতর তমাকে দেখা ক'রবো জবান দিলম।

নোটখানা কুড়িয়ে নিয়ে আর একবার লোলুপ দৃষ্টিতে পিয়ালিকে দেখে উল্‌টো মুখে রওনা হ'ল জটাধর।

পিয়ালি স্তম্ভিতের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে রইলে কিছুক্ষণ। তারপর আপন মনেই একটু হেসে রওনা দিলে ডেরার দিকে। একটু বৈচিত্র্যের নেশা তার মনেও হয়তো লেগেছে।

পিয়ালির সঙ্গে সেই জেদাজেদির পর কুশমণ্ডলে ফিরলে জটাধর। এবারকার ফসল খুব ভালো না হ'লেও সব জমিতেই মোটামুটি ধান হ'য়েছে। পাকতেও সুরু করেছে কিছু কিছু।

কিন্তু তখন আর কিছু চিন্তা করবার অবকাশ ছিল না জটাধরের। কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর ধান সমেত তিনখানা জমি চ'লে গেল গোলক দত্তের হাতে। এক কাঁড়ি নগদ টাকা! দিশেহারা হ'য়ে গেল জটাধর। তারপর রওনা হ'য়ে গিয়েছিল গিধনিতে। পিয়ালি তার কাছ থেকে বায়নার টাকা নিয়েছে। রাজু অধিকারীর চেয়ে চুক্তিতে সব দিকেই তাকে কিছু বেশী কবুল ক'রতে হ'য়েছে। তবু আপত্তি নেই জটাধরের। পিয়ালিকে নিয়ে দল খুলতে পারলে এক বছরের ভেতর সব টাকা উঠে আসবে। টুসু পরবের দেরী নেই আর। তার আগে তৈরী দল চাই। জটা অধিকারীর দল। পিয়ালির নাচ। লোকের মুখে মুখে ফিরবে জটা অধিকারীর নাম। কাণা হ'য়ে যাবে গিধনির রাজু।

পিয়ালি হাত পেতে টাকা নিলে।

এতদিন পরে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হ'ল জটাধর।

ঠিক হ'ল, এ দলের অন্ধ বায়েন মাতামদাসও যাবে নতুন দলে। আজ পাঁচ বছর সে আছে পিয়ালির সঙ্গে সঙ্গে। তার হাতের বাজনা ছাড়া পিয়ালির নাচের পা খোলে না। গান বাঁধার হাতও মাতামদাসের মিঠে। যে গানটাকে উপলক্ষ্য ক'রে এত কাণ্ড, সেটা মাতামদাসের বাঁধা শুনে অভিভূত হ'য়ে গেল জটাধর। বায়েনের বায়না বাবদ আরও দশটা টাকা তুলে দিলে পিয়ালির হাতে।

কথাবার্তা সব পাকা। কেবল কয়েকটি দিন সময় চেয়ে নিলে পিয়ালি। এতদিনকার অধিকারীকে ছেড়ে যাবার আগে একটা ছলচাতুরি চাই। একটা গোলমাল পাকিয়ে মন কষাকষি করা দরকার। সে দায়িত্ব সে নিজেই নিলে।

জটাধরকে আপ্যায়ণে ত্রুটি করেনি পিয়ালি। বিদায় নেবার আগে কটাক্ষ হেনে বল্‌লে, দেখো লতুন অধিকারী, দল ভাঙ্গাই লিই যেয়্যা আবার একদিন পথ দেখতে বুলো নাই!

জটাধর বুকে হাত ঠুকে ব'ললে, জান মাল কবুল আছি বটে। ভয় নাই তমার গো।

হেসে পিয়ালি বললে, সি তমার কবুল থাক চাই নাই থাক, ঝুমরিয়া কিন্তুক তমার হওয়া চলবে নাই।

কেনে? বিব্রতভাবে প্রশ্ন করলে জটাধর।

ফিক্ ক'রে হেসে উঠ্‌লে পিয়ালি। হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ল

তার দেহ। বললে, কেনে আবার, বুঝ নাই? বুড়া ঝুমরিয়ার সঙ্গে কি যুবতী মেয়্যার মন পটে, না লাচ খুলে? জোয়ান ঝুমরিয়া না থাকলে আমার লাচ খুলবে নাই। তা বাপু বলি রাখলম, হঁ।

মনে মনে একটা প্রচণ্ড আঘাত খেলে জটাধর। তবু গ্রাহ্য করলে না সে অপমান। পিয়ালির রূপ তাকে পাগল করেছে। সব শর্তেই সে রাজী।

একটু সামলে নিয়ে জটাধর বললে, বেশ কথা, জোয়ান ঝুমরিয়াই আনা করাইঁ দিব তমাকে।

বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে কৌতুকের উচ্ছল ভঙ্গিতে পিয়ালি ব'ললে, জোয়ান মরদকে বড়ো ভয় বটে তমার?

কেনে, ভয় ক'রবো কেনে?

ভয় থাকা ভালো গো। ব'ললে পিয়ালি। আমার কদর তবে বেশী থাক্‌বে বটে।

জটাধর একটু হাস্‌লে। সহজভাবের হাসি নয়। আশংকার অস্বস্তিতে শুকনো সে হাসি। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে বললে, কবে যাওয়া হবে?

ধরো দশ পনেরো দিন বা।

জটাধরের ধৈর্য ছিল না। তবু তাতেই রাজী হ'য়ে সে বিদায় নিলে।

সেই ফেরার পরই সুদামের সঙ্গে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল। তার ভয় ছিল মাদলটাকে নিয়ে। জোয়ান ছেলে যে নাচুনী নাচের নামে এত ক্ষেপে যাবে তা জটাধর কথনো ভেবে দেখেনি।

তবু সে নির্বিকার।

একদিকে প্রচণ্ড রোখ, অন্যদিকে রূপের দুর্বার নেশা।

সুদাম বেরিয়ে যাবার পরে সে কিছুক্ষণ ধ'রে ছেলের উদ্দেশ্যে একতরফা গালিগালাজ করেও যখন সেদিক থেকে কোনো সাড়া পেলে না, তখন উঠোনে পা ছড়িয়ে শুয়ে আবার গান ধরলে,—

হায় হায় একি বিষম দায়-য়-য়—।

সারারাত দু'চোখের পাতা এক ক'রতে পারেনি সুদাম। অস্থির উত্তেজনায় মাথা ক্রমেই গরম হ'য়েছে। ছটফট ক'রে কেটে গেল প্রায় সারাটা রাত।

ভোরবেলা মোরগ ডাকার পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে সে বাঁধের দিকে চ'লে গেল।

তখন ভোরের আলো সবে ফুটেছে। হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কনকনে বাতাস। রাত ভ'রে গাছের পাতায় পাতায় জ'মেছিল শিশিরবিন্দু। তারই দু'এক ফোঁটা টুপটাপ ক'রে ঝ'রে পড়ছে শুকনো মাটির ওপর। ফিকে কুয়াশায় ছেয়ে আছে চারিদিক। ডুংরির ওপরে বড়ো করম গাছটাকে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

দূরে পূবপ্রান্তে লাখড়া পাহাড়ের পেছন থেকে সকালের সূর্য দেখতে দেখতে আকাশে উঠে পড়লো। অঘ্রাণ প্রভাতের কুয়াশা আর সূর্যরশ্মির ফাঁকে ফাঁকে ঝিলমিল ক'রতে লাগলো কুশমণ্ডলের আবাদী প্রান্তরটা।

রুদ্ধ ক্ষোভ চেপে একটা মুগরো ঝোপের পাশে ব'সে পড়লে সুদাম। একটু পরেই গরু ছাগল নিয়ে মানী বাঁধের ধারে আসবে। আগের দিন বিকেলেও সুদামের মনে যে দোটানা ভাব ছিল, তা একটা রাত্রের মধ্যেই কেটে গেছে। আজ সকালেই মানীর সঙ্গে বোঝাপড়া পাকাপাকি ক'রে সে বেরিয়ে পড়বে মৌলবনীর পথে।

মানী তার রোজকার অভ্যাস মতো ঠিক সময়েই এলো। অত সকালে থমথমে মুখে সুদামকে দেখে অবাক হ'য়ে সে কাছে এসে ভয়ে ভয়ে বললে, তর কী হইঁছে রে সোদাম?

সুদাম চোখ তুললে। গম্ভীর স্বরে বললে, সি অনেক কথা। বুড়াটা নাচুনী নাচের দল খুলছে আমার ঘরে।

মানী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো। নাচের দল খুলতে অনেক টাকা লাগে। তত টাকার জোর কোথায় জটাধর সর্দারের? কথাটা কিছুতেই তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু সুদামের কথায় আর হাবভাবে অন্তত তামাশার চিহ্ন নেই কোথাও।

দাঁতে দাঁত চেপে ধানভরা জমির দিকে তাকিয়ে ছিল সুদাম। মানী কিছু

প্রশ্ন করবার আগেই সে বললে, আমি ঘর বাঁধবো মন করি জমিন চাইছিলম। বুড়া ঝুমুর মেয়্যা পুষবে বলি জমিন বন্ধক করি দিঁছে।

মানী ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন ক'রলে, আখন কোনটা করবি?

সুদাম বললে, চলি যাবো গিধনী।

হঠাৎ যেন এক ঝলক রক্ত ছলকে উঠলো মানীর বুকের ভেতর। তীব্র আনন্দে সে দিশেহারা হয়ে গেল। অতি কষ্টে উচ্ছ্বাসের সেই তীব্রতা চেপে সে বললে, এত হঠাৎ কি মন ঠিক করতে হয়?

সুদাম বললে, মন আমার ঠিক। নাচনী পুষার হাল তর জানা নাই?

মানীর জানা আছে। কি মেয়ে, কি পুরুষ সবাই জানে ঝুমুর দল খোলার পরিণাম। সারা পরগণার মাটিতে বছর বছর ধরে অনেক চোখের জল মিশেছে এরই জন্যে।

ব্যথিত-স্বরে সে বললে, এতদিনে কেনে তর বাপের ইটা মতলব হল রে?

সুদাম সে প্রশ্নের উত্তর দিলে না। বললে, বুড়াটো বাঁচি থাকতে এক ছটাক জমিনেও আমার মালিকানা নাই। যিদিনকা মরবে সিদিনকা একখানও জমি থাকবে নাই বুড়ার। সব যাবে নাচুনীর পায়ে।

বুড়াকে রুখবি নাই? প্রশ্ন করলে মানী।

উঁহু।

তর এত সাধের জমিন ছাড়ি চলি যাবি?

যাব। তকে লিই চলি যাব, ইজ্জত রাখবো তর।

তা হবে নাই। তু ইখানকে থাক সোদাম।

হঠাৎ সাপের ছোবল খাওয়ার মতো চমকে উঠলে সুদাম। তীব্র দৃষ্টিতে মানীর দিকে তাকিয়ে বললে, ই কথা কেনে? কী হ'ল তর?

বড়ো বড়ো চোখ দু'টি তুলে বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকালে মানী। আস্তে আস্তে বললে, জমিন তর জেবনের সাধ। তাকে ছাড়াই করি লিই যা'তে আমার মন চায় নাই সোদাম। বড় কষ্ট হবে তর!

তর কষ্ট হবে নাই?

মানী চোখ নামিয়ে নিলে। কোনো জবাব দিলে না।

প্রভাতের রাঙা-রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে দু'টি মুখের ওপর। সেই নরম

আলোয় চিকচিক করছে মানীর কানে রূপোর গাঁঠিয়া দুটো। সুদাম অপলক তাকিয়ে রইলে। মেয়ে জাতটাই যেন এক রহস্য!

কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে সুদাম বললে, জমিন আমার জেবনের সাধ। তর সাধটো কি কোনো কম?

ভিটা ছাড়বি, জমিন ছাড়বি—তর দুখ্ হবে নাই বল?

নাই। দৃপ্তস্বরে সুদাম বললে, তকে পাবো তাই ছাড়বো উ সব। লতুন করি আমি জমিন ক'রবো, জিরাত ক'রবো, ঘর বাঁধবো। আপন বুক ঢালি মরদকে ভালোবাসে, তেমন মেয়্যা ঘরকে থাকলে জোয়ান মরদের কোনো বাধাটো বাধা নাই।

আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো মানীর বুক। এত উচ্ছ্বাসের ভার সে যেন আর বইতে পারছে না।

সুদাম বললে, আমি মৌলবনীকে ফিরি চল্লম আজ। মাসেকের সময় লিলম। ঝাড়গ্রাম গিধনি ঘুরি আসবো। গোছগাছ করি লিব সব। মাসেকের মাঝে তর বিয়ার কথা হ'লে আমাকে খবর করবি বল্?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে মানী।

সূর্য অনেকটা উঠে পড়েছে। আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

মানী চাপাস্বরে বললে, মাসেকের বেশী হ'লে আমার আগ হবে কিন্তুক।

এতক্ষণ পরে সুদামের মুখে একটু হাসি ফুটলো। মৃদু হেসে বললে, তবে আজই চল্।

মানী অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্লে, তর্ খালি তামাশা।

সুদাম হাসলে। সারারাত ধ'রে মনের ওপর যে গুরুভার জ'মে উঠেছিল তা অনেকটা হালকা হ'য়ে গেছে। তবু একটা কাঁটা যেন কোথায় খচ্খচ্ ক'রে বেঁধে। বাঁধের গায়েই সবচেয়ে ভালো দু'খানা জমি। ধানের ভারে নুয়ে পড়েছে শীষগুলো। এই জমি, এই ধান তার হ'য়েও তার নয়।

মানী এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে গেছে খানিকটা। তার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলে সুদাম।

মাটি-লক্ষ্মী ভূমিজের ঘরে থাকতে চায় না। অনেক দিন আগেই তো তার আসন ট'লেছে। মানীর মতো এমন ক'রে দু'বাহুর বন্ধনে সে তো সুদামকে আকর্ষণ ক'রলে না। মানী তাকে টানছে। একবুক ভালোবাসা নিয়ে তাকে ঘিরে রেখেছে। আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে তার মন। সে পাশে পাশে থাকলে

আবার সব হবে। করালী সর্দারের নাতি আপন মুরোদেই সব ক'রবে আবার। নাই বা হ'ল সে জমি কুশমণ্ডলে। সারা দুনিয়া জুড়েই তো মাটি আছে।

নতুন জীবন, নতুন স্বপ্ন! বিভোর হ'য়ে মানীকে দেখতে লাগলো সুদাম। মানী তখন নীচু হ'য়ে গরুর খুঁটো নিয়ে ব্যস্ত। একবার চোখাচোখি হ'তেই ফিক্ ক'রে একটু হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

সুদামও হাসলে। বিজয়ী যৌবনের আত্মপ্রসাদের হাসি।

মৌলবনীতে ফিরে এসে প্রথম দু'চারটে দিন সুদামের কেটে গেল অনেকটা বেহুঁশের মতো। মনের অস্থিরতার জন্যে নেশার বহরও ক'দিনে বেশ বেড়েছে।

সে চ'লে যাওয়ার পর নতুন কারিগর নিতেই হ'য়েছিল ভরতলালকে। লোকটা বয়সে সুদামের চেয়ে অনেক বড়ো। মেজাজে একেবারে উলটো। ভরতলাল যা হুকুম করে তাতেই সে কৃতার্থ। ভরতলাল মনে মনে ভেবে রেখেছিল, মাসখানেকের মধ্যে নতুন কারিগর বিহারীকে মোটামুটি কাজগুলো শিখিয়ে তুলতে পারলে সুদামকে সুযোগমতো বরখাস্ত ক'রে দেওয়ার সুবিধে হবে। কিন্তু এক মাস তো দূরের কথা, পরদিনই ফিরে এলো সুদাম। ভরতলাল একটু গজগজ ক'রলে বটে, কিন্তু সুদামকে তাড়িয়ে দিলে না।

তিন চারটে দিন কেটে গেল নির্বিবাদে।

সেদিন ছিল রবিবার। ঘাটশিলার হাট বসে রবিবারে। ভরতলাল সকালেই চ'লে গেছে হাটে। ফিরবে রাতের প্যাসেঞ্জারে।

বিকেলের প্যাসেঞ্জার গাড়ীখানা সেদিন প্রায় দু'ঘণ্টা দেরীতে ছুটছে। সুদাম ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাড়ীর ঘন্টির শব্দে যখন ঘুম ভাঙলো, তার অনেক আগেই সন্ধ্যে উৎরে গেছে। থমথমে প্লাটফরমের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভেতর শুধু টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলছে গোটা তিনেক বাতি।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো। সেই গাড়ী থেকেই সেদিন মৌলবনীতে নামলে পিয়ালি। সঙ্গে মাতামদাস বায়েন। স্টেশনে নেমে পিয়ালি বড়ো বিব্রত বোধ ক'রছিল। গিধনিতে গাড়ী ধরবার সময় মাতামদাস ভালোই ছিল। কিন্তু দু'টো স্টেশন ছাড়তে না ছাড়তেই হি হি ক'রে কাঁপিয়ে জ্বর এসেছে তার। শোবার জায়গা দূরের কথা বস্‌বারও জায়গা ছিল না গাড়ীতে।

একে অন্ধ, তাতে আবার হঠাৎ জ্বর। তার ওপর গাড়ীর দেরী।

অসহায়ের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে পিয়ালি কোনো কূল কিনারা পেলে না। কয়েক পা গেলেই ভরতলালের চায়ের স্টল। মাতামদাসকে ধ'রে নিয়ে সেদিকেই এগিয়ে চ'ল্লে সে। যাহ'ক একটা বসবার মতো জায়গা আগে চাই। একটু চা খাইয়ে দু'দণ্ড বসিয়ে যদি লোকটাকে চাঙ্গা ক'রে তোলা যায়। এই ক্ষীণ আশা টুকুই তখন তার সম্বল।

মাতামদাস বারান্দায় একটু জায়গা পেয়েই শুয়ে পড়লে। বোঁচকা বুচকিগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে পিয়ালি এক কোণে হেলান দিয়ে ব'সলে। ক্লান্তিতে দুশ্চিন্তায় সেও অবসন্ন।

গাড়ী ছাড়বার আগেই সুদামের কেটলি খালি হ'য়ে গেছে। দ্রুতপায়ে সে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। পা থমকে থেমে গেল ছোট্ট সিঁড়িটায়। এক ফালি ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে পিয়ালির মুখে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সুদাম। পিয়ালি নাচুনীকে চিনতে এক মুহূর্ত দেরী হ'ল না তার। ঝুমুরের খবর যে একটু আধটুও রাখে, সে-ই চেনে পিয়ালিকে।

অন্য সময় হ'লে সুদামের মুগ্ধ দৃষ্টিটুকু উপভোগ ক'রতো পিয়ালি। হয়তো ঠাট্টা মস্করা ক'রতেও পেছপা হ'ত না। কিন্তু সে সময়ে সে অবস্থা তার ছিল না। সুদামকে দাঁড়াতে দেখে বিনয়ের মিহি স্বরে সে ব'ললে, একটু চা খিয়াবো গো কারিগর?

কেনে খিয়াবো নাই? বসো—

ঘরে ঢুকে গেল সুদাম। গলা একটু চড়িয়ে পিয়ালি ব'ল্লে, দুভাঁড় দিও কিন্তুক। আর একজনা আছে।

গন্‌গনে আগুনে দু'ভাঁড় চা ক'রতে এক মিনিটও লাগলো না। চায়ের ভাঁড় দু'টো পিয়ালির হাতে দিয়ে সুদাম সাগ্রহে ব'ল্লে, নাচনা কুথাকে হবে গো?

চায়ে চুমুক দিয়ে পিয়ালির অবসাদ কিছুটা কেটেছে। মুচকি হেসে সে বললে, কারিগরের যেমন কথা! পালা নাই, পরব নাই—আখুন আবার নাচনা কুথাকে হবে বটে?

সুদাম অপ্রতিভ ভাবে বললে, তবে?

সি দুর্ভোগের কথা আর পুছ কেনে? কুশমণ্ডল গিরামের নাম জানো? জটা সদ্দারকে চিনা আছে? সি খুলছে বটে লতুন দল। তার ঘরকেই যাচ্ছি। কিন্তু গাড়ী দেরী করি বড়ো ঝামেলি হ'ল গো কারিগর।

শেষের কথাগুলো হয়তো স্পষ্টভাবে কানেও গেল না সুদামের। যে পিয়ালির নাচ দেখতে দশ গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে পড়ে সেই পিয়ালিকে নিয়েই দল বাঁধছে জটাধর!

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলে পিয়ালির দিকে। জটাধর এতখানি এগিয়েছে তা সে ভাবতেও পারেনি।

সুদামের অদ্ভুত চাউনি দেখে কেমন বিব্রত হ'য়ে পড়লে পিয়ালি। থতমত খেয়ে বললে, কী হ'ল গো তমার কারিগর?

সম্বিত ফিরে পেলে সুদাম। তবু কেমন যেন গোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব। একদিকে তার দাবীদখল, অন্যদিকে এই রূপসী মেয়েটার লোভের থাবা। মাঝখানে জটাধর সর্দার। নতুন ঝুমুর দলের নতুন অধিকারী।

শরীরের সমস্ত রক্ত যেন হঠাৎ মাথায় চ'ড়ে গেল। কর্কশকণ্ঠে সুদাম বললে, যিথান থেকা তুমি আ'লে সিথানকেই ফিরি যাও নাচনী। কুশমণ্ডলকে তমার যাওয়া হবে নাই।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে গেল পিয়ালির চোখ। বললে, কেনে?

সে প্রশ্নের জবাব দিলে না সুদাম। বিহারীকে আসতে দেখে তার উদ্দেশ্যে বললে, দুটা ভাঁড় চায়ের দাম বুঝি লিস বেহারী।

বলেই বারান্দা থেকে নেমে সে হন্ হন্ ক'রে হেঁটে চ'লে গেল প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে।

বিহারী কিছু জানে না। কেটলি রেখে পয়সা নেবার জন্যে সে পিয়ালির সামনে এলো।

পিয়ালির বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। সেই সঙ্গে অপমানের অসহ্য জ্বালায় জ্ব'লে উঠেছে মনটা।

রুক্ষস্বরে বিহারীকে সে প্রশ্ন করলে, তমার ওই জোয়ান কারিগরটো কোন লবাবের বেটা গো?

বিহারী সাদাসিধে মানুষ। থতমত খেয়ে বললে, কেনে, কী কর‍্যাছে তমার?

সে কথার জবাব না দিয়ে আপন মনে ফুঁসতে লাগ্‌লো পিয়ালি। সে আর সব কিছু সহ্য করতে পারে। পারে না কেবল জোয়ান মরদের তাচ্ছিল্য।

বিহারীও পিয়ালি নাচুনীকে চিনতে পেরেছে। একগাল হেসে সে প্রশ্ন করলে, কুথাকে যাওয়া হবে বটে নাচনীর?

মনে মনে যতো আক্রোশই জমুক, এই বিপন্ন মুহূর্তে অন্তত একজন কারও ভরসা থাকা দরকার। বিহারীর দিকে কোমল দৃষ্টিতে একবার তাকালে পিয়ালি। বললে, যাব বটে কুশমণ্ডলের জটা সদ্দারের ঘরকে।

বিস্ময়ে হাঁ হ'য়ে গেল বিহারী। বললে, তা বলতে হয় গো। যিটাকে লবাবের বেটা বুল্‌লে তুমি, সিই তো জটা সদ্দারের বেটা গো। উয়ার নাম বটে সোদাম।

দাঁতে দাঁত চেপে পিয়ালি অস্পষ্ট স্বরে বল্‌লে, হুঁ, তাই এত ঝাঁজ বটে!

কথাটা বিহারী বুঝতে পারেনি। কী মনে ক'রে সে বললে, নাচনী দল বাঁধায় লেগা বাপে বেটায় মন কষাকষি। কেনে, কুনো কড়া কথা বুলছে তমাকে?

নাই। স্পষ্ট মিথ্যে জবাব দিলে পিয়ালি।

মাতামদাস কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। তারই ভেতর থেকে বললে, কেনে মিছা কথা বুলছিস পিয়ালি?

তু থামবি? ফুঁসে উঠলে পিয়ালি।

ধমক খেয়ে মাতামদাস চুপ ক'রে গেল।

পিয়ালি কয়েকমুহূর্ত কী যেন ভাবলে। তারপর বিহারীকে বললে, উ কারিগর কুথাকে গেল জানো তুমি?

জানি বটে। কেবিনের উধারকে অর ঘর আছে, সিথানকে বসি আথন নিশা খাবে।

পিয়ালি উঠে দাঁড়ালে। জিদ চেপেছে তারও মাথায়। বললে, ঘরটো চিনাইঁ দিবে আমাকে?

বিহারী একগাল হেসে বললে, কেনে দিবো নাই? চলো—

মাতামদাস মুখের ওপর থেকে কাঁথা সরিয়ে বললে, আথন উ গোঁয়ারটোর কাছকে যাবি নাচনী?

হুঁ, যাবো।

কেনে, কী দরকার হ'ল তর?

তাতে তর কি কাজ? দরকার আমার আছে।

মাতামদাস আর কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস পেলে না। আবার কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল।

পিয়ালি বললে, য্যাতখন না ফিরি, ইখানকেই থাকিস।

মাতামদাস ফাঁপা গলায় হুঁ বলে সম্মতি জানালে।

বিহারীকে সঙ্গে ক'রে প্লাটফর্মে নেমে পড়লে পিয়ালি।

বিহারী ঠিকই বলেছিল। স্টল থেকে বেরিয়ে সোজা নিজের ঘরটায় গিয়ে গায়ের চাদরখানা চারপাইয়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে সুদাম। তারপর এক কোণ থেকে আধখাওয়া একটা মদের বোতল বার ক'রে সবটুকু গলায় ঢেলে দিলে।

এখন কিছুক্ষণের মতো নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'তে পারছে কই?

বারে বারে চোখের সামনে ভেসে উঠছে পিয়ালি নাচুনীর মুখখানা।

নাচুনী মেয়েটা তাকে বিভ্রান্ত ক'রে দিয়েছে। অঙ্গে অঙ্গে অত রূপের ছটা। চাউনিতে অমন বিদ্যুৎ-ঝলক! ও রূপ কত মরদের বুকে আগুন জ্বালিয়েছে কে জানে! এবারের পালা জটাধরের।

রূপ তো নয়, বিষের থলি। কটাক্ষের ছোবলে ওই বিষই ঝ'রে পড়ে নতুন নতুন শিকারের অঙ্গে। বিষে বিষে অঙ্গ নীল। তারপর একসময় ঢ'লে পড়ে দিশেহারা পুরুষটা।

কাঁচি মদের ঝাঁজ। সেই সঙ্গে বিদ্বেষের জ্বালা।

ঝিম ঝিম করতে লাগল সুদামের মাথা। হঠাৎ উঠে বসলে চারপাইয়ের ওপর। জটাধর কত টাকা বায়না ধরিয়ে রেখেছে কে জানে?

ব'সে কী একটু ভেবে আবার চোখ বুজে শুয়ে পড়লে সুদাম। মরুকগে জটাধর সর্দার। পাখা যার উঠেছে তাকে ঠেকাবে কে?

কারিগর!

হঠাৎ নারীকণ্ঠের ডাক শুনে কয়েকমুহূর্তের জন্যে বিহ্বল হ'য়ে গেল সুদাম। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

একটা দেশলাই কাঠি জ্ব'লে উঠল।

দরজায় কপাট ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে পিয়ালি নাচুনী। তার পাশে দেশলাই কাঠি হাতে বিহারী।

নেশা তখন সবে ধরতে সুরু করেছে। চোখের পাতা শিথিল হয়েছে একটু। উঠে বসলে সুদাম। সবে আমেজ ধরা চোখে তার মনে হ'ল পিয়ালি নাচুনীর চাউনিতে ঝাঁজ নেই। যা আছে তা অন্য জিনিষ। মানীর চোখে এমন চাউনি সে কখনো দেখেনি।

ততক্ষণে ঘরের ভেতরে এসে এককোণ থেকে একটা কেরোসিনের টেমি টেনে এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে বিহারী।

পিয়ালি বললে, তুমি অমন ধারা চলি আলে যে কারিগর?

আমার খুশি হ'ল। কর্কশ স্বরে বললে সুদাম।—নাচুনী দেখি ভুলে তেমন মরদ আমি নাই বটে।

পিয়ালির মুখে ফুটে উঠ্ল শ্লেষের হাসি। মিষ্টিস্বরে বললে, তাই পাছে বা ভুলি যাও সি ভয় হ'ল আমাকে দেখি?

বিহারী হ্যা হ্যা ক'রে হেসে উঠ্‌লে। কথাটায় সে খুব মজা পেয়েছে।

এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিলে সুদাম।

ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বিহারী বললে, তো একটা বিড়ি দে সোদাম। আমি টিশনকে যাই।

একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিলে সুদাম। বিড়িটা কানে গুঁজে বিহারী পিয়ালিকে বললে, উ শালা ভুমজের মাথাটা সদাই এল্‌জিনের বাইলার হইঁ আছে বটে। সমঝে কথা বুলো নাচনী।

বিহারী বেরিয়ে গেল। দরজা ছেড়ে অসংকোচে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালে পিয়ালি।

তুমি জটা সদ্দারের বেটা?

হঁা। সিটা বটে আমার বাপ।

বাপের সঙ্গে তমার বিবাদ কেনে?

তাতে তমার কাম কি বটে?

কর্কশ উত্তরেও পিয়ালি একটু বিচলিত হ'ল না। ঠোঁটে আবার ফুটে উঠ্‌লো চাপা হাসি। বললে, কাম আমার আছেই বটে কারিগর। তমার বাপকে বুলছিলম জোয়ান ঝুমরিয়া চাই আমার। তমার মতো জোয়ান রইঁছে ঘরে ই কথা তো সি বুললে নাই? তুমি গান বুলতে জান কারিগর? আমার লতুন ঝুমরিয়া হবে তুমি?

সুদাম তখনো একেবারে বেসামাল হ'য়ে পড়েনি। পিয়ালির কথা শেষ হবার পর কয়েক মুহূর্ত তীব্র বিতৃষ্ণায় তাকিয়ে হঠাৎ থুঃ ক'রে থুথু ছিটিয়ে দিলে মেঝেয়।

থুঃ, থুঃ—। তর নাচনী নাচে থুক দিই আমি।

সামলে নিতে একটু সময় লাগল পিয়ালির। এমন পুরুষ তার জীবনে

এই প্রথম। পুরুষের এই অবজ্ঞা পিয়ালি নাচুনীর কাছে নতুন জিনিষ।... মুখে একটু একটু ক'রে ফুটে উঠ্‌ল সেই মোহিনী হাসি। তার সবচেয়ে সেরা অস্ত্র।

বাপরে, নাচনী মেয়্যা বলি এত আগ তমার কারিগর? কেনে আমি মানুষ নই বটি?

সুদাম গুম হ'য়ে ব'সে রইলে। কোনো জবাব দিলে না। অসংকোচ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে পিয়ালি। সুদামের এত কঠিন ঘৃণাতেও নির্বিকার। খোলা দরজা দিয়ে এক এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে আছড়ে প'ড়ছে ছোট্ট ঘরখানার ভেতর। পিয়ালির কালো শাড়ীর আঁচলটা হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ফুলে উঠ্‌ছে মাঝে মাঝে। ডিবির সামান্য আলোতেই ঝলমল ক'রছে ওর নাকছাবি আর হাতের বাজু। আর একবার না তাকিয়ে পারলে না সুদাম।.. ......লোকে বলে, নাচুনী মেয়েরা মায়াবিনী। বশ ক'রতে তাদের জুড়ি নেই। এ মেয়েটাও সে মায়ামন্ত্র জানে। শিখেছে সেই উচাটনের কৌশল। পাহাড়ী ময়ালের মতো নিঃশ্বাসের গুণ দিয়ে কাছে টানে। তারপর নাগালের ভেতর পেয়েই পাকে পাকে জড়িয়ে চূর্ণ ক'রে দেয় ওরা।

কিগো কারিগর, আগ হ'ল বলি খিয়াল নাই কিছু? আমার কথার জবাব দিলে নাই যে?

হঠাৎ গর্জন ক'রে উঠ্‌লে সুদাম। পুঞ্জীভূত আক্রোশ ফেটে পড়ল তার কথায়।

কেনে আগ জান নাই তুমি? আমার জমিন, ভিটা আর ভাতের দামে তমার গায় গহনা ঝলমল ক'রবে, তুমি জান নাই? বেরাই যা,—বেরা আমার ঘর থেকা—

হুংকার দিয়ে চারপাই থেকে উঠে দাঁড়ালে সুদাম। ভয়ে অস্ফুট চীৎকার ক'রে পেছিয়ে গেল পিয়ালি। এতক্ষণে সে সত্যিই ভয় পেয়েছে। পা টলছে সুদামের। লালচে চোখ দু'টো থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

মরীয়ার মতো ক্ষেপে উঠেও আর বিশেষ কিছু ক'রলে না সুদাম। ধপ্ ক'রে আবার ব'সে পড়লে। পিয়ালি ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে তখন।

নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

একটু পরে আর একবার ঢুলু-ঢুলু চোখ তুলে তাকালে সুদাম। জড়িয়ে জড়িয়ে ব'ল্‌লে, আর আমাকে ঘাঁটাও নাই। ঘিথানকে যাচ্ছ যাও—।

নির্জীব কণ্ঠে পিয়ালি ব'ল্লে, তমার সঙ্গে আলাপ সালাপ না হ'লেই বোধ করি ভালো ছিল কারিগর।

সুদাম ব'ল্লে, বড়ো দরদ তমার বটে নাচনী! জটা সদ্দারের সব ফতুর করি যিদিনকা আবার লতুন ভাড়ুয়ার দলকে চলি যাবে উদিনকাও থাকি তো ফের আলাপ করি যা'তে পারবে।

পিয়ালির চোখ দু'টো হঠাৎ জ্ব'লে উঠ্ল! ব'ল্লে, তাই চাও তাই করি যাব বটে! কথা দিই গেলম কারিগর।

দমকা হাওয়ার মতো বেরিয়ে গেল পিয়ালি। সুদাম কিছুক্ষণ ঠায় ব'সে রইলে। তারপর আপন মনে হা হা করে খানিকটা হেসে শুয়ে পড়লে চারপাইয়ের ওপর।

কাঁচি মদের উগ্র ঝাঁজে অবশ, বেসামাল দেহ।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন ঝলমলে রোদে ভ'রে গেছে চারিদিক। চোখ রগড়ে চারপাই থেকে নেমে পড়লে সুদাম। আর একটা রাত কাজ কামাই। ভরতলালের বিরক্ত মুখখানার কথা মনে হ'তেই একটু ঘাবড়ে গেল সুদাম। চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লে ঘর থেকে।

সকালের পার্শ্বেল-গাড়ীর দেরী নেই। বিহারী একাহাতে তেলেভাজার সরঞ্জামগুলো নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। সুদাম যখন এলো তখন সে জল আনতে গেছে। ঘর ফাঁকা।

ভরতলাল তখনো এসে পৌছয়নি।

কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্ত। এক ভাঁড় চা তৈরী ক'রে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালে সুদাম। কাল সন্ধ্যেবেলায় যে জায়গাটায় পিয়ালি ব'সেছিল সেখানটা ফাঁকা।

সকালের মিষ্টি রোদ লুটিয়ে প'ড়েছে পাহাড়ের গায়ে, পাথরে পাথরে, শাল পলাশের মাথায় মাথায়। প্লাটফর্মের আসন গাছটার মোটা গুঁড়িতেও এসে লুটিয়ে পড়েছে এক ঝলক আলো। এক ঝাঁক পাখী কিচির মিচির ক'রতে ক'রতে উড়ে গেল দক্ষিণে। সুবর্ণরেখার চড়ায় কিম্বা ক্ষীণ স্রোতের

ধারে ধারে সারাদিন ধ'রে চ'লবে ওদের আহার অন্বেষণ। চার নম্বর সাইডিং-এর ওপাশে লম্বা আকাশমণি গাছটার সরু সরু পাতাগুলো সর্সর্ ক'রে কাঁপছে মৃদু হাওয়ায়।

একটু পরেই এক বালতি জল নিয়ে ফিরে এলো বিহারী। সুদামকে বলবার জন্যে সকাল থেকে একরাশ কথা তার পেটে গজগজ ক'রছিল। চোখাচোখি হ'তেই বালতিটা নামিয়ে রেখেই ব'ললে, তর আক্কেল বটে বলিহারি যাই সোদাম! একটা জরুয়া রুগীকে লিই মেয়্যাটা মুস্কিলে পড়্যাছে—কুথা দু'টা মিঠা কথা বুলবি না ভাড়াই দিলি?

সুদাম বিস্মিত হ'য়ে ব'ললে, জরুয়া কে হ'ল বটে?

কেনে, কানা বায়েনটা? রুগীকে লিই সারা রাতটো টিশন ঘরের উধারকে কাটাই দিল নাচনী! খানা পাকাই দিলম আমি। হাতে হাতে দাম মিটাই দিল। আঘণের শীত তো বটে—

আরও কিছু ব'লতে যাচ্ছিল বিহারী। তাকে থামিয়ে দিয়ে সুদাম ব'ললে, আছে বটে আখন?

নাই রে। সকালকে আলো ফুটতেই রওনা হই গেল তর ঘরকে।

সুদাম খালি চায়ের ভাঁড়টা ছুঁড়ে দিয়ে ব'ললে, আপদ গেইছে। যা, আর একটা চা তিয়ার কর্। উটা খায়ে কামে হাত দিব।

বিহারী ঘরে চ'লে গেল। অন্যমনস্কভাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলে সুদাম। কোথায় যেন একটু বিষাদের ছোঁয়া লেগেছে আজকের সকালে।

পিয়ালি এসে পৌছতেই জটাধরের যেন উৎসব লেগে গেল।

তার বাড়ীতে কারণে অকারণে লোকের আসাযাওয়া বেড়ে গেল হঠাৎ। পিয়ালি নাচুনী এসেছে কুশমণ্ডলে। ফুর্তির বান ডেকেছে সারা গাঁয়ে।

একা মানদা শুধু চোখের জল মোছে।

পৌষ মাস প'ড়ে গেছে।

সংক্রান্তিতে টুসুর পরব। এদিক ওদিক আসর সুরু হ'য়ে যাবে তার আগে থেকেই।

জটাধর ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। এই পরব দিয়েই দলের আসর সুরু হ'ক—এই তার ইচ্ছে।

মাতানদাস একটু সুস্থ হ'তেই জটাধর বললে, দু'চারখান নতুন গান বাঁধো বায়েন। সি তমার রাজুর দলকে যা হ'ত তা হ'ত। জটা অধিকারীর দলকে উসব পুরানো মাল চলবেক নাই।

কাছেই ছিল পিয়ালি। মুচকি হেসে বললে, তবে তো তমার নাচনীও খারিজ হয় গো।

একগাল হেসে জটাধর বললে, তকে খারিজ করিতো নিজেও খারিজ। দুই খারিজে একজোটে দেশান্তরী হব বটে।

হাসি না পেলেও হাসে পিয়ালি। খুশি রাখতে হয় অধিকারীকে। এটুকু নিখুঁৎভাবে আয়ত্বে আছে তার।

জটাধর তাকে নিয়ে বিভোর। তার একটু তুষ্টির জন্যে দিশেহারা। পিয়ালি তা বুঝতে পারে। অষ্টপ্রহর পাওয়া প্রশস্তির ষোলো আনা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করে সে। তবু তৃপ্তি নেই। সুদামের সেই বিতৃষ্ণার দৃষ্টি মনে পড়লেই বুকের ভেতর জ্বালা ধরে। সে জ্বালা কিছুতেই মেটে না।

মানদার সঙ্গেও অন্তরঙ্গতার চেষ্টা ক'রেছে পিয়ালি। কিন্তু মানদা প্রতিবারই কঠোর বিমুখতায় পাশ কাটিয়ে যায়।

পিয়ালির লজ্জা নেই।

দুপুরে কোনোদিন জটাধর বাড়ীতে না থাকলে গুটি গুটি পায়ে মানদার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মুচকি হেসে বলে, আমি বড়ো বিহায়া বটি। আবার এলম তমার কাছকে।

ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মানদা।—কেনে, যি বুড়া আমার কপাল খেয়াছে তার কথায় মন ভরে নাই তর?

কখনো বা বিশ্রী গালাগালি দিয়ে শাপশাপান্ত করে। তাতেও মুখ ভার নেই পিয়ালির। বলে, তুমি আগ কর আর মান কর—তমাকে আমার বড় ভালো লাগলো বটে বউ।

মানদা কোনো কোনোদিন তীব্র রাগে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেলে। স্বামীর অবহেলায় যে আক্রোশ প্রতি মুহূর্তেই মনের ভেতর গুমরে মরছে তাই হঠাৎ সকরুণ অনুনয় হ'য়ে গ'লে পড়ে সেই কান্নার সঙ্গে।

ঘর জোড়াছিল, সুখ খেয়াছিস—তবু একটুক মায়া দয়াও কি নাই তর মনে? মায়ের পেটে জন্ম হয় নাই যে তর!

অবস্থা এরকম মোড় নিলে তখনকার মতো পালিয়ে পরিত্রাণ পায় পিয়ালি।

দিন যাচ্ছে আর পিয়ালিও হাঁপিয়ে উঠছে। প্রথম দিন থেকেই এখানে তার বিরুদ্ধে যেন একটা চক্রান্ত আরম্ভ হ'য়ে গেছে। আসরে নামলে যার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গিতে হাজার চোখে অফুরন্ত বিস্ময়, ঘরে তারই ওপর একটি বিগতযৌবনা নারীর এত অবজ্ঞা। পিয়ালিকে দশ বিশ গাঁয়ের লোকে জানে। মানদাকে চেনে ক'জন?

দিনের বেলা অসহ্য লাগে পিয়ালির। সন্ধ্যের পরই সারাদিনের গ্লানি কোথায় তলিয়ে যায়। নতুন নাচের মহড়া, নতুন গানের সুর আর হাড়িয়ার স্রোতে সমস্ত দিনটুকু যেন তরল হ'য়ে মিশে যায় রাতের অন্ধকারে। মদের নেশায় ভুলে যায় সব কিছু! যতক্ষণ জ্ঞান থাকে হাসে, গান গায়। কোনোদিন বা খিল্ খিল্ ক'রে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায়। টলতে টলতে গিয়ে টিকারা কিম্বা ঢোলকটা মাতামদাসের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে, বাজাও বায়েন, আজ নাচ ক'রব বটে!

মাতামদাস বিনা প্রতিবাদে বাজনা সুরু ক'রে দেয়। নাচ সুরু করে পিয়ালি। ট'লে ট'লে পড়ে এর ওর গায়ে। বিস্রস্ত বেশবাস সামলানোর খেয়ালও থাকে না তখন। চক্‌চক্ ক'রে ওঠে জটাধরের চোখ। হৈ হৈ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে বীভৎস উল্লাসে। হাসির দমকে লুটিয়ে পড়ে পিয়ালি।

তারপর আস্তে আস্তে নেশায় অবশ সর্বাঙ্গ শিথিল হ'য়ে আসে। আচ্ছন্নের মতো মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ে। সেই ভাবেই হয়তো কেটে যায় দুরন্ত শীতের রাতটুকু।

খরচে কোনো ত্রুটি রাখেনি জটাধর। মুখের কথা খসতে না খসতেই শখের জিনিষ হাজির। ঘাটশিলার হাট থেকে এসেছে নতুন বাজু, নতুন তোড়া। ঝকঝকে চাঁদির জৌলুষে চোখ ঝলসে যায়। আরও এসেছে কলকাতার ছাপা শাড়ী। একটা না একটা কিছু আসছেই ফি হাটবারে। আর সেই সঙ্গে আছে রোজকার বরাদ্দ অঢেল মদ।

পিয়ালির কাছে এসব নতুন নয়। আগেও অনেক পেয়েছে। তবু অরুচি নেই। নতুন শাড়ী, নতুন গহনা, বোতল বোতল মদ। চোখে দেখলেই ঝিম ধ'রে যায় মাথায়। কোনো মতেই সামলাতে পারে

না। রাত একটু গভীর হ'তেই বেহুঁশ হ'য়ে পড়ে। জটাধর তো অনেক আগেই অচেতন।

বেহুঁশ হয় না মাতামদাস।

অন্ধ মানুষ—নিজের বুঝ তাকে বুঝে চ'লতে হয়। মাঝে মাঝে দু'এক ভাঁড় খায় বটে। পীড়াপীড়ি করলেও তার বেশী খাবে না। হৈ হুল্লোড় থেমে যাবার পর সব যখন নিঝুম হ'য়ে যায় তখন সে বসে তার অতি প্রিয় মরব্বা যন্ত্রটা নিয়ে। ছোট মাটির কেঁড়ের ওপর চামড়া দিয়ে ছাওয়া। একটা লম্বা বাঁশের নলের সঙ্গে বেহালার মতো টানা দিয়ে বসানো দু'টি তার। ছড়ি দিয়ে বাজাতে বাজাতে বিভোর হ'য়ে আপন মনে গান গায় মাতামদাস। সেগুলো ঝুমুরের গান নয়: কখনো দেহতত্ত্ব, কখনো বা গ্রাম্য প্রেমের গান। কোনোটা নিজের রচনা, কোনোটা বা শুনে শেখা।

প্রাণ ঢেলে গাইতে থাকে মাতামদাস। স্তব্ধ নিঝুম রাতের বাতাসে কেঁপে কেঁপে সে গানের সুর ছড়িয়ে যায় দূরে।

আর একজনের চোখে ঘুম নেই।

একা ঘরে শুয়ে মানদা রোজই মাতামদাসের গান শোনে। জটাধর তার চোখের ঘুম কেড়েছে। টুকরো টুকরো ক'রে দিয়েছে তার মনের শান্তিটুকু। গান শোনে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মানদা। কোনো কোনো দিন গুমরে গুমরে কাঁদে। তারপর গানও এক সময় থেমে যায়। রাত কিন্তু অত তাড়াতাড়ি শেষ হয় না।

ক'দিন পরেই বায়না ধ'রতে বেরিয়ে গেল জটাধর।

ফিরে এলো চার পাঁচ দিন পরেই। তিনটে আসরের কথা পাকা। বায়নার টাকাও পেয়েছে হাতে। পিয়ালির নামেই তো সব পয়। ফেরার পথে পিয়ালির জন্যে নিয়ে এলো আর এক প্রস্থ গহনা।

সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে অনেক কথা ব'লে যাচ্ছিল জটাধর। অধিকারী হিসেবে নিজের কেরামতির ফিরিস্তি। পিয়ালি সব কথাই শুনছিল। কিন্তু কেমন যেন উদাসীন ভাব।

ক্ষুণ্ণ হ'য়ে জটাধর ব'ললে, তর কী হইঁছে বল তো পিয়াল ? তিন তিনটা আসর ধরি আ'লম কিন্তুক তর মুখে হাসি নাই !

পিয়ালি ব'ললে, আসর আমার মেলাই ঘুরা আছে অধিকারী। তমার লতুন শখ, তুমি ফুর্তি করো।

তর ফুর্তি হবেক নাই ?

দিনাপাওনার সম্বন্ধ আমার। উটা ঠিক থাকলেই হ'ল।

নিরুত্তাপ কণ্ঠের একটা কথায় জটাধরের অত উৎসাহ সে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলে।

বিষণ্ণস্বরে জটাধর ব'ললে, তর সঙ্গে আমার খালি দিনা. পাওনারই সম্বন্ধ বটে ?

নয় কেনে ? ঘরকে তমার পরিবার আছে, বেটা আছে। আমি তমার কে ? কী দাবী দখল আমার তা বলো ?

মুহূর্তে চেহারা পালটে গেল জটাধরের। কর্কশ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন ক'রলে, বুড়ীটা কিছু বুলছে তকে ?

নাই।

তবে মুখ ভার কেনে ? কথায় বিষ কেনে অত ?

সি তুমি বুঝতে লারবে অধিকারী।

জিদ চেপে গেল জটাধরের মাথায়। পিয়ালি উঠতে যাচ্ছিল, খপ্ ক'রে তার হাত ধ'রে ব'ললে, তু বল, আমি বুঝ্‌ব বটে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পিয়ালি ব'ললে, মেয়্যামানুষের সব কথা মরদকে বুঝতে নাই।

ধীর মন্থর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পিয়ালি। জটাধর কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্বের মতো সেখানেই বসে রইলে।

পিয়ালির হঠাৎ নিস্পৃহ ব্যবহারে একটু মুষড়ে পড়লেও ক'দিন পরে সে সব কথা জটাধরের মনেও রইল না। দশ বারো দিনের মাথায় গোছগাছ ক'রে বেরিয়ে পড়তে হবে। তার আগেই এদিককার বিলিবন্দোবস্ত হওয়া চাই। ঝোঁকের মাথায় গড়া দল। সাজ পোষাক নেই, রীতিনীতি জানা নেই। সব দিকেই বিশৃঙ্খলা।

দিশেহারা হ'য়ে গেল ঝুমুর দলের নতুন অধিকারী জটাধর সর্দার। হাতের নগদ টাকা ক'টি দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল।

দু'প্রস্থ ঝকঝকে পোষাক এসেছে নাচের জন্যে। একপ্রস্থ গিল্টির গহনা। পাথরের মালা, জরির ফিতে তো আছেই।

সব কিছুর ভেতর ওড়না দু'খানাই বেশী পছন্দ হ'য়েছে পিয়ালির। উলটে পালটে বারবার ক'রে দেখছিল। গায়ে দিয়েও দেখলে কয়েকবার।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাই দেখছিল জটাধর।

হঠাৎ তাকে একটা কথায় পিয়ালি যেন আকাশ থেকে কঠিন মাটির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

সব কিছুই তো ক'রলে গো অধিক্কারী, ঝুমরিয়া কুথা? আমার সঙ্গে গান বুলবে কে বটে?

জটাধর ভীষণ ভাবে ঘাবড়ে গেল। এ সময় মেয়েটা যদি বেঁকে বসে তবে দড়ি পড়বে হাতে। তাড়াতাড়ি ব'ললে, হবেক বটে, তর ভাবনা নাই।

হ'লেই হ'ল? ঠোঁট উলটে পিয়ালি ব'ললে।—তেমন জোয়ান মরদ না পাও তমার বেটা সোদাম তো আছে। গান বুলতে জানে নাই তমার বেটা?

থতমত খেয়ে জটাধর ব'ললে, হুঁ, গান বুলতে জানে বটে। কিন্তক সোদাম—

তার কথা শেষ হ'তে দিলে না পিয়ালি। মুচকি হেসে ব'ললে, লাচের পা আমিই শিখাইঁ দিব বটে। উকে আনা করাও।

জটাধর গুম হ'য়ে গেল। গম্ভীর ভাবে ব'ললে, উকে কী কাম? আমি ভিন ঝুমরিয়া আনা করবো, তু ভাবিস নাই।

পিয়ালি হাসতে লাগ্‌লো।

সে হাসির অর্থ জটাধর বুঝতে পারলে না।

একটু পরেই অন্য কথায় ঝুমুরিয়ার প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল তখনকার মতো।

দেখতে দেখতে রওনা হওয়ার দিন এসে গেল।

আর একটা দিন মাত্র বাকী।

হঠাৎ মাইনের টাকা চেয়ে ব'সলে পিয়ালি। জটাধরের চোখের সামনে নেমে এলো একরাশ অন্ধকার। গাড়ীভাড়ার গোণাগুণতি ক'টি টাকা ছাড়া আর একটাও নগদ টাকা নেই হাতে। কিন্তু পিয়ালি একেবারে বেঁকে ব'সেছে।

নগদ টাকা হাতে না পেয়ে এক পা-ও নড়বে না সে। অথচ মাইনের চুক্তিটা হ'য়েছিল অতিরিক্ত হিসেবে। ঝুমুর মেয়ে অধিকারীর কাছে খোরপোষ পায়, সাধ আহ্লাদ মেটাবার রসদ পায়। রূপ আর যৌবনের এই মূল্যেই তারা খুশি। এইতো সারা পরগণার দস্তুর।

কিন্তু পিয়ালি তাতে খুশি নয়। জটাধর রোখের মাথায় তাকে কিছু মাস মাইনেও কবুল ক'রেছিল। সেই টাকার জন্যেই বেঁকে ব'সেছে পিয়ালি।

করুণ অনুনয়ে জটাধর ব'ললে, তর আখনই ট্যাকার দরকার হ'ল পিয়াল?

পিয়ালি বাঁকা চাউনির সঙ্গে ব'ললে, দরকারের কথা কেনে তুলো? পাওনা পাই, মিটাই দিবে—ই তো হ'ল বটে কথা। ঝুমুরনী পুষবে তো ট্যাকাও মজুত থাকা চাই অধিকারী।

কেনে, তর কি খা'তে পরতে কষ্ট হচ্ছে বল্? কথা দিলম, গাওনার ট্যাকায় তর ট্যাকা পয়লা মিটাইঁ দিব, হঁ।

তাতেও রাজী নয় পিয়ালি। স্পষ্ট বিদ্রুপের সঙ্গে ব'ললে, যাখন গাওনা থাক্‌বে নাই, তাখন কী ক'রবে বল? আর এক গাওনার লেগা বসাইঁ রাখবে?

প্রচণ্ড রাগে ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠলে জটাধর। তবু নিরুপায়। এতখানি সে আশা করেনি। এ অবস্থায় একমাত্র উপায় আর একখানা জমি। ধান উঠে গেছে জমির। দাম অনেক কম মিলবে। বন্ধকী ক'রলে তো আরও কম।

কয়েক মুহূর্ত ভাবলে জটাধর। তারপর কঠিন স্বরে ব'ললে, বেশ, তর পাওনা মিটাইঁ দিব কাল।

পিয়ালি মুচকি হেসে ব'ললে, অধিকারীর মিজাজ ইকেই বলি বটে।

ভুঁইঞা আর ভূমিজের কয়েকপুরুষের ইতিহাসে বারবার যা ঘ'টেছে তারই পুনরাবৃত্তি আবার হ'ল পরদিন সকালে। নতুন কিছু নয়। ভূমিজ সর্দারের অধিকার থেকে আর একখানা জমি চ'লে গেল সুবর্ণ বণিক ভূম্যধিকারীর ক্রমপ্রসারিত অধিকারের সীমানায়।

কয়েকখানা নোট আর একগাল হাসি নিয়ে ঘরে ফিরলে জটাধর। মেয়েছেলের কাছে যদি ইজ্জৎ গেল তবে মরদের ইজ্জৎ আর রইল কোথায়?

পিয়ালি ঘরের দাওয়ায় ব'সে ছিল। হাতে কাজ নেই তাই খেলা ক'রছিল একটা ছাগলছানা নিয়ে।

উঠোনের একপাশে ধানের মরাই। যে ক'খানা জমিতে এখনো হাত পড়েনি তাদেরই দানের ফসল।

মরাইয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে ধান ঝাড়াই করছিল মানদা। পিয়ালি মাঝে মাঝে দেখছে তাকে। মানদা ভুলেও পিয়ালির দিকে তাকাচ্ছেনা একবার। সেই আনন্দেই মুচকি মুচকি হাসছে পিয়ালি। আর ছাগলছানাটাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খাচ্ছে তার মুখে।

সেই সময়ই এলো জটাধর।

কোনো ভূমিকা নেই। কোনো তোয়াজ তোষামোদ নেই। তিনখানা দশটাকার নোট ছুঁড়ে দিলে পিয়ালির সামনে।

লে তর পাওনা। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আত্মপ্রসাদ মেশানো সে এক অদ্ভুত ভঙ্গি।

পিয়ালি মুচকি হেসে তাকালে একটু। তারপর টাকাগুলো সযত্নে তুলে নিয়ে ব'ললে, আগ না নকি!

পরিত্রাণ পেয়ে বিব্রত ছাগলছানাটা এক লাফে নেমেই ছুট দিলে বাইরের দিকে।

জটাধর ব'ললে, আমার ট্যাকার উশুল দিয়া চাই, হঁ।

দিব। দাম বুঝি পা'লে কামও বুঝাইঁ দেয় পিয়ালি নাচনী।

পিয়ালি আঁচলের খুঁটে নোট ক'খানা বাঁধতে যাচ্ছে—হঠাৎ পাগলের মতো ছুটে এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে মানদা। চিলের মতো চিৎকার ক'রে উঠ্‌লে সেই সঙ্গে।

ট্যাকা ফিরাইঁ দে কালামুখী, ফিরাইঁ দে ট্যাকা। যমখুয়ারি মাগী, মরণও নাই তর? মর, মর, কুঠ হ'ক তর গায়—

মানদা পাগলের মতো চেপে ধ'রেছে পিয়ালির হাত। বাঘিনীর মতো ক্রুর নৃশংসতায় জ্ব'লে উঠেছে দু'টো চোখ। ফোঁস ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস পড়ছে। আঁচল লুটোপুটি খাচ্ছে মাটিতে।

ব্যাপারটা ঘ'টে গেল অতর্কিতে। জটাধর কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিহ্বল হ'য়ে প'ড়েছিল। পরক্ষণেই তার পৌরুষ সদম্ভে রুখে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লে মানদার ওপর। কঠিন হাতে মানদার চুলের মুঠি ধ'রে টান

দিলে। মানদার তবু গ্রাহ্য নেই। পাগলের মতো চেঁচাতে লাগলো, নাই রে, উ ট্যাকা উকে লিতে দিব নাই আমি। উ আমার সব খাবে, উ আমার সব পুড়াইঁ খাক করি দিবে রে—

এক ঝটকায় মানদাকে টেনে ফেলে দিয়ে জটাধর বিশ্রী একটা গালি দিয়ে ব'ললে, দূর হইঁ যা। দূর হ বজ্জাত মাগী—

ছিটকে প'ড়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলে মানদা।

সীমাবদ্ধ শক্তি যখন প্রবলের কাছে নিঃশেষে পরাভূত হয় তখন বঞ্চিতের মন শুধু একটি মাত্র শক্তির ওপরই নির্ভর করে। তা হ'ল অভিশাপ।

অজস্র অভিশাপের ভাষা ছিটকে বেরিয়ে এলো মানদার মুখ থেকে। তারপর সে ভাষা ভেঙে পড়লো উদগত কান্নার হাহাকারে।

পিয়ালি একবার তাকিয়ে দেখলে শুধু। তারপর নির্লিপ্ত ঔদাসিন্যে বিস্রস্ত বেশবাস ঠিক ক'রে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

সেইদিনই বিকেলে দলবল রওনা হ'য়ে গেল। হাসতে হাসতে চ'লে পড়ছে পিয়ালি! জটাধরের মুখেও হাসি ধরে না।

সকালের তুচ্ছ ঘটনার রেশমাত্র নেই তখন। যেন নিতান্তই সাময়িক একটা ব্যাপার। তার জের সকালেই মিটে গেছে।

মানীর কাছে সময় নেবার সময় এক মাসই দীর্ঘ ব'লে মনে হ'য়েছিল সুদামের। কিন্তু একটা মাস যে কখন দেখতে দেখতে কেটে গেল তা খেয়ালই ছিল না। এর মধ্যে একবার ঝাড়গ্রাম ঘুরে এসেছে, কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। মৌলবনীতে ব'সে কুশমণ্ডলের অনেক খবরই ভাসা ভাসা ভাবে কানে এসেছে, তার ভেতর মানীর খবরটাই কেবল নেই। জটাধরের কথা শোনে আর মাথার ভেতর আগুন জ্বলে। থাক মানী, করুক সে কোনো গোপ-মরদের ঘর। সুদাম গিয়ে দাঁড়াবে জটাধরের মুখোমুখি। তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে লোকটার দড়িপাকানো হাল্‌কা দেহটা। চুলের মুঠি ধ'রে দূর ক'রে দেবে ঝুমুর মেয়েটাকে। তারপর ভূমিজের ছেলে আবার মাটিকে আঁকড়ে ধ'রে আরম্ভ ক'রবে নতুন জীবন।

কিন্তু মানী?

এই ছোট্ট প্রশ্নটা দিশেহারা ক'রে তোলে সুদামকে। মুরোদ থাকলে মাটি আবার হবে, কিন্তু মানীকে ছাড়লে তো আর পাওয়া যাবে না। তার মানী, তার মনের মেয়ে। কথায় কথায় যার গাল ফোলে, পলকে পলকে যার মান হয়, মান ভাঙে। চোখের জলে, ঠোঁটের হাসিতে, মনঢালা ভালোবাসায় যে মেয়েটা তাকে দিনের পর দিন আপন থেকে আপনতম ক'রে নিয়েছে তার জুড়ি কি মিলবে কোথাও?

ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হ'য়ে পড়ে সুদাম। আরও বেশী ক'রে মদ খায়। মাটির জন্যে তো জীবন নয়, জীবনের টানেই মাটির টান। সে জীবনটা কিনে নিয়েছে মানী। তার দাবী কি কম?

একটা মাস নষ্ট হ'য়েছে। মানীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। ব্যবস্থাও হয়নি কিছু। এক একটা ক'রে দিন যাচ্ছে আর অস্থিরতা বাড়ছে সুদামের। এদিকে ভরতলালের অসুখ। কাজের চাপ অনেক বেশী। দোকানের সব দায়িত্বই তার ওপর। এর ভেতর সময় ক'রে নেওয়া কঠিন। তবু দু'চার দিনের মধ্যে কুশমণ্ডলে যাওয়া ঠিক ক'রে ফেললে সুদাম। অন্তত এক বেলার জন্যেও যেতে হবে। মানী ব'লেছিল, এক মাসের বেশী দেরী ক'রলে সে রাগ ক'রবে। হয়তো সত্যিই সে রাগ ক'রে ব'সে আছে। তার গাল ফোলা মুখখানা যেন সুদামের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আপন মনেই একটু হেসে মাটির ভাঁড়গুলো বালতির ভেতর সাজাতে লাগলো সে। গাড়ীর খবর হ'য়ে গেছে।

বিহারী বাইরে কোথায় ছিল। হন্তদন্ত হ'য়ে ঘরে ঢুকলে। একগাল হেসে বললে, হাইরে বাপ, মেয়্যাটো কী বাহারের সাজ চড়াইছে রে সোদাম! আসছে বটে তর কাছকে হি হি—

সুদাম প্রশ্ন ক'রতে যাচ্ছিল। তার আগেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ালে পিয়ালি। সারাগায়ে ঝকঝকে রূপোর গয়না ঝলমল ক'রছে। রং ঠিকরে পড়ছে সোনালি ছাপের শাড়ী থেকে। খোঁপায় গোঁজা একথোপা অমরী ফুল, কপালে টিপ, চোখে কাজল।

সব মিলিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ-ঝলক।

ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলে সুদাম। মুচকি হাসি ফুটে উঠ্‌ল পিয়ালির ঠোঁটের ফাঁকে।

শক্ত র বুলি একটা কথাও বুলবে না কারিগর?

সুদাম সামলে নিলে নিজেকে। বললে, যাওয়া হচ্ছে কুথাকে?

ধলভূমগড়। উচ্ছলভাবে বললে পিয়ালি।—বায়না গা'তে যেছি গো। হায় হায়, এত মরদের মনে রং ধরাই, আর তমার মন পা'লম নাই কারিগর!

বিহারী অতিথিপরায়ণ। একগাল হেসে বললে, একটু চা খাবে গো ঝুমুরনী?

খিয়াও। সোদাম সখা তো চন্দ্রাবলীকে খাতির ক'রবেক নাই, তমার খাতিরটুকুই লিব বটে।

বিহারী বুঝুক আর না বুঝুক হাসলে খানিকটা। তারপর চায়ের কেটলিটা চাপিয়ে দিলে উনুনের ওপর।

পিয়ালি চোখ মিটমিট ক'রে বললে,তুমি কেমনধারা মরদ গো বটে কারিগর?

কেনে, কী করলম তমার?

কিছু যে করলে নাই তাই তো বুলছি, কেমন ধারা মরদ বটে। এতদিনে একবার ঘরকে যাওয়া ক'রলে নাই?

সি আমার খুশি।

পিয়ালি মুখ টিপে ব'ললে, যাই তুমি বলো—আখন বুঝি কারিগরের আমার চক্কর আছে, বিষ নাই বটে।

সুদামের মুখ কালো হ'য়ে গেল। ব'ললে, তমার মতন একটা মেয়্যা-মানুষকে বিষের নমুনা কি দিখা করাবো?

ই কথা বটে? ঘাড় কাৎ ক'রে মুখ টিপে অদ্ভুত এক মোহিনী ভংগিমায় হাসলে পিয়ালী। যেন গ্রাহ্যই নেই কিছু। তারপর টেনে টেনে ব'ললে, ভাবলম, শত্তুরের মতন শত্তুর পা'লম ইবার—খেলা আমার জমবে। তা আর তুমি হ'তে দিলে নাই গো কারিগর।

সময় তো খতম হই গেল নাই, আরও থাকবে। ব'ললে সুদাম।

গাড়ীর ঘণ্টা বেজে উঠল।

চমক ভেঙে পিয়ালি ব'ললে, যাই কারিগর। বাঁচি থাকলে দিখা হবে আবার।

পিয়ালি চ'লে গেল।

একটু পরেই মাটি কাঁপিয়ে গাড়ীখানা এসে দাঁড়ালো।

হৈ হৈ ক'রতে ক'রতে জটাধরের দল উঠে গেল পেছন দিককার একটা কামরায়। জানলার ধারে বসেছে পিয়ালি। খিল্ খিল্ করে হাসছে সে।

অনেকদিনের জমানো গ্লানি আজ তার অনেকখানি কেটে গেছে।

মানদা এতদিন পরে একটু প্রাণ খুলে কাঁদবার অবকাশ পেয়েছে। দলবল নিয়ে জটাধর রওনা হ'য়ে যাবার পর বিকেল থেকে রাত একপ্রহর পর্যন্ত সে গলা ছেড়ে কেঁদেছে। সেই সঙ্গে শাপশাপান্ত ক'রেছে পিয়ালিকে। শেষে অবসন্ন হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ক'দিন পরে পড়ন্ত বেলায় সুদাম এসে হাজির।

তাকে দেখে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ফেললে মানদা। চোখের জল আর বাঁধ মানতে চায় না।

সুদামের মন একেই ভাল ছিল না, তার ওপর উঠোনে পা দিতে না দিতেই মানদার কান্না। বিরক্ত হ'য়ে সে বললে, এতই যদি তর কষ্ট হ'ল তো আমার কাছকে চলি গেলি নাই কেনে?

দ্বিগুণ অভিমানে মানদার চোখে হু হু করে জল নেমে এলো। বিকৃত স্বরে বললে, কেনে যাবো? কেনে যাবো আমি? বাপের সঙ্গে বাদ হ'ল তো নিজের পথ দেখলি, মায়ের কথা ভাবনা করলি একবার? এমন বেটার কাছকে কেনে যাবো বল্?

সুদাম বললে, নাই যাবি ত মর্।

হুঁ, মরবো বটে। তর বাপ আর কত দুখ্ দেয় সিটা দেখি তবে মরবো।

সুদাম দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে, হুঁ, কুঁকড়া লিই গেল যাক, কিন্তুক শিয়ালের আক্কেলটা তো বুঝা গেল বটে! দুখ্ বাসতে সাধ তো কাঁদা করছিস কেনে? চুপ কর্—

মানদা অসহায়ভাবে ছেলের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে চোখের জল মুছে নিলে। লাল চোখ দু'টোয় জমাট বেঁধে উঠলো বিশ্রী এক স্তব্ধতা। কালবৈশাখীর আগে থমথমে আকাশের মতো।

করালী সর্দারের ভিটেয় অলক্ষীর যে অভিশাপ নেমেছে তাই যেন স্তরে স্তরে জমাট বাঁধছে মানদার স্তব্ধ চোখের তারায়।

সুদাম এদিক ওদিক তাকিয়ে বাড়ীর অবস্থা দেখছিল। হঠাৎ মানদার দিকে চোখ পড়তে তারও কেমন অস্বস্তি লাগলো। রাগের ঝাঁজ কমিয়ে আপোষের সুরে বললে, ঘর-দুয়ার ঝাড় পুছ করা ছাড়ি দিইছিস মা?

হুঁ। যার ভিটা তার সাধ যায় করি লিবে।

সুদাম আর কিছু বললে না। উঠোনে কতদিন ঝাড়ু পড়েনি কে জানে! দাওয়ার কোণে ইঁদুরের মাটি জ'মে জ'মে বেশ উঁচু হ'য়ে উঠেছে। ঘরের পেছনকার হরতুকি গাছটার ঝরা পাতাগুলো ছড়িয়ে রয়েছে সারা উঠোনে। চারিদিকেই শ্রীহীনতার ছাপ। তার মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিমের ঘরখানা। ঝক্‌ঝক্ ক'রছে নিকোনো দেওয়াল আর দাওয়া। চালে নতুন খাপরার ছাউনি প'ড়েছে। ঘরের দরজায় ঝুলছে একটা বড় টিপতালা।

সুদাম মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে। মানদা আর সহ্য ক'রতে পারলে না। অসহ্য রাগে ফেটে প'ড়ে বললে, কী দেখছিস বটে? কুলখাকী মেয়্যাটোর ঘর দ্যাখ্—ভালো করি দ্যাখ্, তর বুড়া বাপ আমার কপাল কেমন করি পুড়াইছে দ্যাখ—

আবার একরাশ কান্নার ঢেউ এসে আছড়ে পড়লে মানদার গলায়। আবার হু হু ক'রে জলের ধারা নামলো দু'চোখে। কাঁদতে কাঁদতে বললে, মন করলম তকে বিয়া করাই ঘরকে আমার বউ আনবো। উ সাধ আমার মরি গেইছে বাপ। ই পাপের ঘরকে বউ আর আনবো নাই রে—।

সুদাম বললে, তর বউ ই ঘরকে আসবে নাই। লতুন ঘর বাঁধবো আমি।

আনন্দে, আবেগে একেবারে দিশেহারা হ'য়ে পড়লে মানদা। চোখের জল শুকোয়নি কিন্তু মুখে ফুটে উঠলো হাসি। কী বলবে দিশে না পেয়ে সে সুদামের মাথায় বার বার হাত বুলোতে লাগলো। তারপর একটু প্রকৃতস্থ হ'য়ে বললে, তাই কর্ বাপ, তর কাছকে যাই থাকবো আমি।

বেলা পড়ে আসছে। রাত ন'টার মধ্যেই আবার মৌলবনীতে ফিরে যেতে হবে। মানদার উচ্ছ্বাস নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না সুদামের। বললে, তু ভাবিস নাই, সব বেবস্থা আমি করবো।

কথাটা ব'লেই সে প্রস্থানোদ্যত হ'ল। মানদা কিছু বুঝতে না পেরে বললে, কুথাকে যাচ্ছিস?

সুদাম জবাব দিলে না।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ালে মানদা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সুদামের হাবভাব লক্ষ্য ক'রে আবার প্রশ্ন ক'রলে, কুথাকে যাচ্ছিস তা বল্—

তর্ কি দরকার?

হুঁ, দরকার আছে বটে। বাগাল-পাড়াকে যাওয়া তর হবে নাই সোদাম।

মুহূর্তে আগুন চ'ড়ে গেল সুদামের মাথায়। অসহ্য রাগে বললে, কেনে হবে নাই? কে বাধা দিবে?

আমি। তকে আমি যা'তে দিব নাই—

আর্তনাদ আর করুণ অনুনয় মিশে গেল মানদার অস্ফুট কথা কয়টির মধ্যে। গ্রামে এরই মধ্যে সুদাম আর মানীকে নিয়ে কথা উঠেছে। বাগালেরা আকারে ইঙ্গিতে জটাধরকে শাসিয়েছে। জটাধর হয়তো মদের ঝোঁকে খেয়াল করেনি অথবা তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবার অবকাশ তার ছিল না। কিন্তু মানদার মনে সেইদিন থেকে আর এক নতুন উদ্বেগ আরম্ভ হয়ে গেছে। একটা বংশের দু'পুরুষের ইতিহাস তার চোখের সামনে। তৃতীয় পুরুষের পরিণতি অজানা। কিন্তু রক্তে যে সেই একই ধারা সে কথা কোন সময়ই সে ভুলতে পারে না। মানদা ভেবেছিল, সুদামের সঙ্গে একবার দেখা হ'লে তাকে বুঝিয়ে বলবে। নিজের লুকিয়ে রাখা দু'একখানা চাঁদির গহনা আর মাটিতে পুঁতে রাখা টাকা সব সুদামের হাতে তুলে দিয়ে তাকে এই অনুরোধই ক'রবে যেন সুদাম ভূমিজের ঘরেরই কোন মেয়েকে ঘরে এনে বাপ দাদার রক্তের মাতনকে এই পুরুষেই থামিয়ে যেতে পারে।

সুদামকে প্রস্থানোদ্যত দেখেই বুক কেঁপে উঠেছিল মানদার। আরও ভয় পেয়ে গেল ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে। আদেশ হ'য়ে গেল অনুনয়, আশঙ্কার উচ্চারণ শোনালো আর্তনাদের মতো।

সুদাম প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই সে ভাবটুকু সামলে নিয়ে বললে, দেরী করাস নাই, সর্—

মানদাকে সরিয়ে দিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়ালে সুদাম। বাঁধের ধারে এই সময় মানী আসে গরু ছাগলগুলোকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে। সময়ও কম।

মানদা পেছন থেকে অসহায়ের মতো অনুনয় ক'রতে লাগলো, আমার কথা শুন্‌রে সোদাম, যাস নাই বাপ আমার—

সুদাম পেছন ফিরেও তাকালে না। হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চ'ললে রকন ডুংরির পথে।

টুসু পরব শেষ হ'য়ে যেতেই উদ্‌বেগে দিন গুণতে সুরু করেছে মানী। সুদাম কবে এসে পড়বে তার ঠিক নেই। এদিকে তাকে নিয়ে চাপা

কথা সুরু হ'য়ে গেছে এদিক ওদিক। উৎকণ্ঠার শেষ নেই তার। সেই সঙ্গে অভিমান। বাপের সঙ্গে মনান্তর আছে থাক, মানীর সঙ্গে তো কিছু হয়নি। একবার গাঁয়ে আসতেও এত অনিচ্ছা?

উৎকণ্ঠা, অভিমান আর ভয় মিলিয়ে মানীর মনটা দিনে দিনে ভারী হ'য়ে উঠছে।

পূবে লাখড়া ডুংরি পেরিয়ে মাইল চারেক গেলে পাথরচাপড়ি গ্রামে দেবী দ্বারবাসিনীর মন্দির। চলতি নাম দোয়ারসিনী। রঙ্কিনীর মতো বদরাগী দেবী নয়। বরঞ্চ মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ করবার জন্যেই যেন হাত মেলে আছেন দোয়ারসিনী। মানত ক'রলেই বাসনা সিদ্ধ করেন। মানী জোড়া কবুতর মানত ক'রে রেখেছে দোয়ারসিনীর কাছে। নীরব ব্যাকুল মিনতি তার। হেই গো মা দোয়ারসিনী, সি মরদটোর ঘর যেন ক'রতে পাই।

সকালে বিকেলে জল আনা বেড়ে গেছে তার।

বড়ো সড়কের পাশে ইঁদারা। রুক্ষ মাটির কৃপণ দানের জল। কার্তিক পড়তে না পড়তেই জল নীচে নামতে সুরু করে। মাঘের গোড়ায় তো কথাই নেই। দু'বালতি তুলতেই হাঁপ ধ'রে যায়। তবু মানীর ক্লান্তি নেই। জল তুলে আবার কোনো অছিলায় সে জল ঢেলে ফেলে। তবু যে মানুষটার জন্যে এত ছলা কলা, তার দেখা নেই। সড়কের মোড়ে প্রকাণ্ড মহুয়া গাছটার আড়াল থেকে কত লোকের মুখ বেরিয়ে আসে, কত লোক সড়ক ধ'রে হেঁটে যায়—তার মধ্যে সেই একটা মানুষই শুধু নেই।

শেষে অন্ধকারের ছায়া আস্তে আস্তে নামতে সুরু করে। আর দেরী করা চলে না। উদ্গত দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে বাড়ীর পথে রওনা হয় মানী। বুক কাঁপে তার। কে জানে কী হয়!

সেদিনও জল তোলা আর জল ঢালার ছলাকলা শেষ ক'রে মানী যখন বাড়ীর পথে রওনা হ'ল তার আগেই সুদাম চলে গেছে বাঁধের ধারে।

দূর থেকেই কেমন ধাঁধা লাগছিল সুদামের। মানীর বদলে নিতাই গোপ নিজে এসেছে গরু নিয়ে যেতে। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতিটা অনুমান ক'রে নেবার চেষ্টা ক'রলে সুদাম। হয়তো লোকের কানাকানিতে বাইরে আসা বন্ধ হ'য়ে গেছে মানীর।

নিতাই দূর থেকে সুদামকে দেখেছিল। আপন মনেই সে বিড়বিড় ক'রে সুদামের উদ্দেশ্যে কতকগুলি গালাগালি দিলে। বিরক্তি আর ভয় পাশাপাশি ফুটে উঠলো তার মুখে।

সুদাম কাছাকাছি আসতেই একটু কৃত্রিম হাসি হেসে নিতাই ব'ললে, কবে আ'লি সোদাম?

আজ আ'লম।

তা ইখানকে কেনে রে?

জমিন দেখতে।

হা হা ক'রে একগাল হেসে উঠলো নিতাই গোপ। ব'ললে, জমিনটো চোখে দেখি তর লাভ কী রে? উ ধানতো উঠছে বটে গলক দত্তের ঘরকে। নাচনী পুষলি তরা, অঁ?

সবই সে জানে। গোলোক দত্তের টাকায় বাঁধা পড়েছে এতদিনকার মাটি। সে মাটি সর্দারদের ঘরে ফিরবে না আর কোনোদিন। একবার কি দু'বার বন্ধকী, তারপর বিক্রী কবালায় টিপ-সই দিয়ে দেবে জটাধর।

সব জেনেও নিতাই গোপের উপহাসের হাসিটুকু সে সহ্য ক'রতে পারলে না। বললে, নাচনী পুষতে ছাতির পাটা চাই। গোপ বাগালে পারবে নাই উটা।

নিতাইয়ের ভুরু কুঁচকে গেল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, হুঁ, কথাটো ঠিক বটে। নাচনী পুষতে ছাতির পাটা চাই, ভিখ্ মাগতে ছাতির পাটা চাই। উ পাটা গোপ বাগালের নাই বটে।

সুদাম জবাব দিলে না। এ পরিহাসের জবাব নেই। ঝুমুরের সর্বনাশা পরিণাম সবাই জানে। জটাধরকে সত্যিই হয়তো একদিন ভিক্ষায় বেরোতে হবে। সবই সত্যি। তবু করালী সর্দারের নাতি সহ্য ক'রতে পারে না নিতাই গোপের বিদ্রুপ। অকারণ আক্রোশের আগুন চড়ে মাথায়।

নিতাইয়ের কথার জবাব না দিয়ে ডুংরিতে উঠ্তে সুরু ক'রলে সুদাম।

নিতাই কী ভেবে হঠাৎ নরম স্বরে ডাকলে, শুন্‌রে সোদাম—

সুদাম দাঁড়ালে। তার কাছে এগিয়ে এলো নিতাই। ব'ললে, তর বাপের দিমাগ খারাপ হই গেঁইছে। পিয়ালি নাচনীও ভালো মেয়্যা নাই।

উটাকে তাড়াই দিই তর জমিন জিরাত পারিস তো ঠেকাই রাখ বাপ।

সুদাম ব'ললে, হুঁ, দেখবো।

কথাটা বলেই আবার সে ওপরে উঠতে সুরু ক'রলে। অগত্যা চুপ ক'রে গেল নিতাই। যে কথাটা পাড়তে চেয়েছিল তা হ'ল না। বাঁকা দৃষ্টিতে সুদামের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললে, শালা ভূমজের বেটা, আমার কুলে কালি দিলে টাঙ্গির একটা চোপে তর মাথাটা নামাই দিব বটে।

সে কথা সুদাম শুনতে পেলে না। অন্ধকার নেমে আসার আগে ডুংরির মাথায় তার ওঠা চাই। মানী যদি নাও আসতে পারে তবু বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে সুদামকে দেখতে পাবে। আশ্বাস পাবে মেয়েটা।

নিতাই গোপ গরু নিয়ে চ'লে গেল। সুদামকে দেখা অবধি তার বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেছে। তলে তলে যে চেষ্টা তার এতদিনে একটু ঝিমিয়ে প'ড়েছিল তারই কথা দ্বিগুণ ক'রে মনে হ'তে লাগলো। আর দেরী ক'রলে হয়তো একদিন ভিটে-মাটি ছেড়ে রামরতন ভুঁইঞার মতো গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে।

মানীর বিয়ের কথাটা উঠেও ভেঙে গিয়েছিল পণের টাকায় বনিবনা হয়নি ব'লে। নিতাইয়ের দাবী ছিল পাঁচকুড়ি টাকা। অপর পক্ষ তিন কুড়ির বেশী দিতে গররাজী। তখন রাজী হ'লেই হ'ত!

ডুংরির মাথায় বসে সুদাম শুধু দেখলে মানীর বোকাসোকা বাপটা গরু নিয়ে কেঁদ করমের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটার মনের ভাবটুকু তখনকার মতো অজানাই রয়ে গেল তার কাছে।

ডুংরির মাথায় উঠে সেই পাথরখানার ওপর বসে পড়লে সুদাম। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বারকতক তাকালে বাগাল পাড়ার দিকে। মানীর দেখা নেই।

জমিতে জমিতে ধান কাটার মরশুম প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। দূরে দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা মহুয়া গাছ। অনেক দূরে রাকা মাইনস্-এর চিমনিটা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ-প্রান্তরের নির্বাক প্রহরীর মতো।

অনেক কথাই মনে হচ্ছিল সুদামের। এই গ্রাম, এই ডুংরি, এই চিরপরিচিত বাঁধ—সব ছেড়ে গিধনির কোন্ কুলি ধাওড়ায় গিয়ে বাস ক'রতে হবে কে জানে! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে মাটিকে সে ক্রমেই গভীর মমতায়

আঁকড়ে রাখবার সাধকে তিল তিল ক'রে বাড়িয়ে তুলেছে, সেই মাটি চোখের সামনে অপরের বাঁদী হয়েছে। যতটুকু বা আছে, তাও একই পথে চ'লে যাবে। তবু কী এক প্রচণ্ড আকর্ষণ!

আর একদিকে অন্য এক দুর্বার টান। মানী তাকে প্রেম দিয়েছে, তার বদলে তার ইজ্জতটুকু সুদামকে দিতে হবে। কোন্ মেয়ে না ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে চায়?

রাকা মাইনস্-এর চিমনিটার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আপন চিন্তায় কখন বিভোর হ'য়ে গিয়েছিল সুদাম। অন্ধকার নেমে গেছে নীচের প্রান্তরে। ডুংরির মাথাকে তখনো সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলতে পারেনি।

হঠাৎ পেছনেই কিছুটা নীচে কাঁচের চুড়ীর ঝম্ঝমানি শুনে প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফিরে তাকালে সুদাম।

মানী উঠে আসছে।

জল নিয়ে বাড়ী ফেরার পথেই মানী সুদামকে দেখেছে। আর দেখেছে নিতাইকে। বুকে উল্লাসের কাঁপন কিছুতেই কমে না। দাঁড়িয়ে রইলে কয়েক মুহূর্ত। আবার ফিরে গেল ইঁদারায়। তারপর যখন ফিরলে তার অনেক আগেই নিতাই বাড়ী চলে গেছে।

সুদামের সবুর সইলো না। তর্‌তর্ করে নেমে এসে আবেগে মানীর হাত চেপে ধরে বললে, ভালো আছিস?

এতদিনকার রুদ্ধ উৎকণ্ঠা আর আশঙ্কা নিমেষে অভিমানের বন্যা ডাকিয়ে একেবারে আছড়ে পড়লে সুদামের ওপর।

কেনে আর আ'লি গিরামে? যিখানকে ছিলি থাকলেই হত!

সুদাম হঠাৎ একটু বিব্রত হ'য়ে পড়েছিল। পরক্ষণেই অভিমানিনী মেয়েটাকে গভীর আবেগে বুকে টেনে নিয়ে বললে, সিখানকে থাকতে কি আর দিলি রে!

আবেগে, শিহরণে কেঁপে কেঁপে উঠছে মানীর সারা অঙ্গ। অনেক কথা বলবে ভেবেছিল। কোনো কথাই তখন আর মনে এলো না। তীব্র আবেগে সুদামের একখানা হাত চেপে ধরে বললে, আমার ভাবনা হয় বুঝিস নাই? কেনে দুখ্ দিস? কেনে ভাবনা করাস বল্?

সুদাম আস্তে আস্তে তার মাথায় আঙ্‌ল বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, দুখ্ দিতে কি আমার মন চায় রে?

গ্রামে কানাকানি সুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে ভয়, চারিদিকে বাধা।

চুপ ক'রে ব'সে পড়লে মানী। সুদামও বসলে তার পাশে।

সুদাম বললে, তর বিয়ার আর কোনো কথা হ'লো ?

নাই। কথা করলেই আমি বিয়া করবো ?

আশ্বস্ত হল সুদাম। অন্ধকার সবে দানা বাঁধতে সুরু করেছে। মানীর নিকষ কালো গায়ের রঙে অন্ধকারের রং মিশেছে। তারই ভেতর থেকে মানীর ডাগর ডাগর চোখ দু'টো যেন ফুলের মতো পাঁপড়ি মেলে ফুটে রয়েছে সুদামের দিকে তাকিয়ে।

সুদাম বিভোরভাবে বললে, আজই চল্ মানী।

হঠাৎ বুক কেঁপে উঠলো মানীর। তার ইজ্জত রাখবে বলে ভিটে মাটি, মা—সব কিছুর বাঁধনকে মন থেকে কেটে ফেলেছে সুদাম। তারই গরজে সুদামের ঘর ছাড়ার আকাঙ্খা। সবই মানীর জানা। অথচ অতর্কিতে আজই পাড়ি দেবার কথা শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে মানীর মুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। গলাও যেন শুকিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে।

কাঁপাগলায় মানী বললে, আজ ?

আজ নাই হয় কাল, কাল নাই হয় পরশু—একদিন তো যা'তেই হবে বটে। আজ গেলে বাধা কি ?

মানী অস্ফুটস্বরে বললে, কুথা যাবি এখন ?

যিখানকে গেলে বাগালেরা আর তর সুলুক পাবে নাই, সিখানকে কোথাও যাবো। গিধনিকে লতুন শাল-জংগল বসা করাইছে, কাম কাজ পেছে অনেক মেয়্যা মরদ। আগে উখানকেই যাবো—

মানী বিষণ্ণস্বরে বললে, আমার লেগা তর বড়ো কষ্ট হইছে রে সোদাম।

অমন হয়। নিস্পৃহস্বরে সুদাম বললে. মনের মেয়্যার লেগা মরদ যদি কষ্ট নাই করলো তো উটাকে মরদ বুলছে কেনে ?

মানী আস্তে আস্তে চোখ তুলে কী যেন দেখলে। তারপর বললে, ভুমজের মেয়্যা বিযা করি গিরামকেই থাক সোদাম। তর ভিটা, তর জমিন—

বাকীটুকু আর বলতে পারলে না মানী। হঠাৎ তার দুই কাঁধে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে রূঢ় কর্কশকণ্ঠে সুদাম বললে, বার বার উ একটাই কথা কেনে বুলিস ? আমার ঘর ক'রতে মন যদি নাই চায় তো কেনে আমার মন ছুটালি ?

সে কর্কশ স্বর রুক্ষ পাথরের গায়ে গায়ে প্রতিহত হ'য়ে ফাঁকা প্রান্তরের বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বিহ্বল বেদনার্ত চোখে সুদামের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে মানী। জলে টলমল ক'রছে তার চোখ দু'টো। রুক্ষ নীরস পাহাড়ী উপত্যকার মেয়ে। প্রকৃতির কোলের দুলালী। নিজের প্রাপ্য বুঝে নিতে তার সংকোচ নেই, আড়ষ্টতা নেই। তবু কী এক রহস্য। তারই জন্যে এক জোয়ান পুরুষ তার আকৈশোর স্বপ্নসাধকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলে অজানা ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে এ কথা ভাবলেই তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। সেই অসহ্য ব্যথার পেষণে চোখের কোণে জল আসে। সুদাম পুরুষ মানুষ। ভালোবাসার সেই বেদনার জ্বালা সে কেমন ক'রে বুঝবে?

সুদামের কাঁধে মাথা রেখে মানী ধরাগলায় বললে, উ কথা বলিস নাই সোদাম। যিথানকে লিই যাবি, সিথানকেই থাকবো আমি।

একটা কথায় সুদামের সব রাগ জল হয়ে গেল। আবেগে মানীকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে বললে, তর মাথা মাঝে মাঝে খারাপ হইঁ যায় বটে।

মানী একটু হাসলে।

সুদাম বললে, আটদিনের মাথায় অমাবিস্যে। তিয়ার হইঁ থাকবি, উদিনকা যাবো।

মানী ততক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে। চোখের জল মুছে স্বাভাবিক গলায় বললে, কুথাকে দিখা হবে বল্—

একটু ভেবে নিয়ে সুদাম বললে, রাত এক ঘড়ি পার হ'তেই আমি চলি আসবো। টিশন থাকতে আধা কোশের মাথায় সি পাকুড় গাছটোর পিছনকে থাকবো আমি। এগারোটার পাসিঞ্জারেই রওনা হব।

মানী মন শক্ত ক'রে ফেলেছে। দিনক্ষণ সব ঠিক ক'রে নিয়ে উঠে পড়লে।

কখন যে চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেছে তা কারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ হুঁশ হতেই ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেল মানীর মুখ।

তার ভয়ের কারণ বুঝতে সুদামের দেরী হ'ল না। একটু মুষড়ে গিয়ে সে বললে, কী করবি আখন?

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে দ্রুত হাতে কানের একটা ঝুমকো

খুলে ফেললে মানী। সুদামের হাতে সেটা দিয়ে বললে, তর কাছকে থাক। পরে লিব।

হতভম্ব হয়ে সুদাম বললে, কেনে?

ফিক্ ক'রে একটু হেসে মানী বললে, উটা হারাই গেল, তাইতো এত দেরী। তর হাতে আবার নতুন করি প'রবো।

আর এক টুকরো হাসি বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে মানী নেমে গেল তরতর ক'রে। রূপোর ঝুমকোটা হাতে নিয়ে সুদাম কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো হতভম্বের মতো। মেয়েছেলে এতও জানে!

অন্ধকারে মানীকে আর দেখা যাচ্ছিল না। সুদাম কিছুক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে নামতে সুরু করলে। রাতের প্যাসেঞ্জার গাড়ীর অন্ততঃ ঘণ্টা তিনেক আগে তার মৌলবনীতে পৌঁছনো চাই-ই।

বাঁধের ধারে সুদামের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই নিতাই গোপের মাথায় দুশ্চিন্তার যে বোঝা চাপলো সারারাতেও তা নামেনি।

পরদিনই সকালে সে বেরিয়ে গেল।

পণের টাকায় দর কষাকষি ক'রে যে বিয়ের কথাটা কেঁচে গিয়েছিল, সেই কথাকে পাকা করতেই হবে। দু'কুড়ি টাকা যায় যাক। সমাজে মুখ বাঁচুক।

কুশমণ্ডল থেকে মাইল সাতেক দূরে মানীর মামাবাড়ী। মৌলবনীর ওপর দিয়েই যেতে হয়। স্টেশন এড়িয়ে অনেক ঘোরাপথে চলে গেল নিতাই।

শুধু কথা পাকা করা নয়, দিন তারিখও ঠিক হ'য়ে গেল একদিনের মধ্যে। এককুড়ি টাকা আগাম হাত পেতে নিলে নিতাই গোপ। মানীর মামাবাড়ীতে ব'সেই বিয়ে হবে ঠিক হ'ল। মাঝে মাত্র দু'টো দিন। মেয়েকে এনে হাজির করবার দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিতাইয়ের। সবই ঠিক, এখন রঙ্কিণীর দয়ায় মতলবটা ভালোয় ভালোয় হাসিল হ'লেই হয়।

নিতাই যখন বাড়ী ফিরলে তখন গভীর রাত। অঘোরে ঘুমোচ্ছে মানী। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ ঘুম।

ঘুমন্ত মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে মানুষটা কেমন যেন বিচলিত হ'য়ে পড়েছিল। কিন্তু সে ভাব ওই কয়েক মুহূর্তেরই। পরক্ষণেই চাউনি পালটে গেল। বিড়বিড় ক'রে আপন মনেই কী যেন

বললে। টাকা নেই, পয়সা নেই কিন্তু বংশের নামটুকু এখনো আছে। অবুঝ মেয়েটা যদি সে নামে কালি লেপতে চায় তাহ'লে মেয়ের মুখ চেয়েই কি তা মানিয়ে নেওয়া যায়? আপন মনেই নিতাই হাসলে একটু। পেয়ার পীরিতের কি বা এমন দাম! বয়সকালে একটা জোয়ান মানুষকে পেলে ওই মেয়েই একদিন সুদামকে ভুলে যাবে।

নিঃসাড় ঘুমে অচেতন মানীর কানে নিতাইয়ের সে কথাগুলোও পৌঁছলো না, পাতায় ঢাকা ডাগর চোখের দৃষ্টিতে সে হাসিটুকুও ধরা পড়লো না।

• পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মানী শুনলে তার মামীর মরণ বাঁচন অসুখ। যে ক'দিন অসুখ না সারে সে ক'দিনের জন্যে মানীকে রেখে আসবে বলে কথা দিয়ে এসেছে নিতাই। সেইদিনই দুপুরে রওনা হ'তে হবে।

মানী যেন পাথর হ'য়ে গেল।

আড়চোখে মেয়ের মুখের ভাব লক্ষ্য করছিল নিতাই। মানী কিছুই বলছে না দেখে সে একটু ঘাবড়ে গেল। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, তর মামী বুললো —

কথাটা আর এগোলো না। মানীর মামী কী ব'লতে পারে তা আগে থেকে ঠিক ক'রে রাখেনি নিতাই। কথাটা অসমাপ্তই রয়ে গেল।

মামী কী ব'লেছে তা জানবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না মানীর। বিবর্ণ মুখে সে বললে, কতদিন উখানকে থাকতে হবে?

থতমত খেয়েই নিতাই বললে, কত্তদিন আর থাকবি, দু'টো পাঁচটা দিন বটে। তর ভালো নাই লাগে তো তিনচারদিন বাদ ফিরাইঁ লিই আসবো।

তখনকার মতো মানীর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে না। আর ছ'দিন পরেই সেই রাত। যেমন ক'রে হ'ক তার আগে ফিরে আসতেই হবে। না গেলেও উপায় নেই। প্রাণ ভ'রে মানী আবার ডাকলে দোয়ারসিনীকে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হ'ল। বাড়ীর পশ্চিমে অর্জুন গাছ দু'টোর ছায়া একটু একটু ক'রে এগিয়ে আসতে লাগলো উঠোনের পূবের দিকে।

মনে মনে দোয়ারসিনীকে প্রণাম ক'রে, মামীকে গালাগালি দিয়ে বাপের সঙ্গে মামাবাড়ীর পথে রওনা হ'য়ে গেল মানী। মৌলবনীর ওপর দিয়ে

পথ। কিন্তু সুদামের সঙ্গে একটা কথাও বলা যাবে না সেই দুঃখটাই তখন তাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিচ্ছিল।

আগে আগে এগিয়ে চললে নিতাই গোপ। তার কোটরগত চোখে ক্রুর উল্লাস চকচক করছে। পাছে মেয়ের চোখে তা ধরা প'ড়ে যায়!

চলতি পথে পাকুড় গাছটাকে মানী আর একবার ভালো ক'রে দেখে রাখলে। পাছে সেই নিশুতি রাতে ভুল হয়!

মৌলবনীতে ফিরে তার পরের দিনই ভরতলালকে ব'লে গিধনিতে রওনা হ'য়ে গিয়েছিল সুদাম। সস্তায় জমি কেনার সুযোগ নাকি একটা পাওয়া গেছে। সুতরাং তিনচার দিন বাদে ফিরে এসে যাতে জমানো টাকাগুলো পায় তার জন্যেও বারবার ক'রে ব'লে রেখে গেল।

ভরতলাল তাতে মোটেই খুশি হয়নি। দরকার মতো সুদে খাটিয়ে সেই টাকা থেকে তার কিছু কিছু আসে। একসঙ্গে অতগুলো টাকা দিতে গেলে তার মেজাজ খারাপ হওয়ারই কথা। মনে যাই থাক, সুদামের কথায় সে আপত্তি করেনি। সাতপাঁচ বাহানা তুলে যদি আরও কিছুদিন রাম-জীর ইচ্ছায় টাকাগুলো খাটিয়ে নেওয়া যায় তো তাই-ই 'প'ড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা'-র সামিল। নেহাৎ নাছোড় হ'লে তখন একটা আপোষ করা যাবে।

মৌলবনীতে ফিরে আসতে একদিন দেরী হ'য়ে গেল সুদামের। তাহ'লেও মনটা তার আনন্দে ভরপুর। বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে নতুন শাল-জংগল বসছে ঝাড়গ্রাম আর গিধনির মাঝখানে। সারাবছর ধ'রে কাজের কামাই নেই। মোরাম মাটির শক্ত স্তর ভেঙে জমি তৈরীর কাজ চলছে সবে। সে কাজ চলবে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই জমিতে বীজ দেবার কাজ। সাঁওতাল আর লোধা কুলিদের নিয়েও লোকের অভাব মেটে না। বাবুদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই কাজ মেলে।

মৌলবনীর প্ল্যাটফরমে পা দেবার পর থেকে রোমাঞ্চে, শিহরণে সুদামের বুক মাঝে মাঝে কেঁপে উঠতে লাগলো।

গাড়ী ছেড়ে যাবার পরই একগাল হাসি নিয়ে বিহারী এগিয়ে এলো। মাটির ভাঁড় সমেত বালতিটা নামিয়ে রেখে খালি কেটলির ওপর বেতালা হাতে বাজনা সুরু ক'রে দিলে।

অবাক হ'য়ে সুদাম বললে, কী হ'ল বটে তর ?

হ'ল বটে সি একটা বেপার। দিলটো আমার খারিজ হই গেল রে সোদাম। পরশুদিন পাসিঞ্জারে নামলো তর পিয়াল নাচনী। চা খাই গেল আমার কাছকে।

আপন খুশিতে ভরপুর মন সুদামের। অন্য সময় হ'লে পিয়ালির নামে হয়তো রেগে উঠতো। তার বদলে বিহারীকে একটা বিড়ি দিয়ে বললে, এক ভাঁড় চা খিয়াতেই দিল খারিজ করি দিলি বটে ?

হঁ, দিলম। খুশি হ'য়ে বললে বিহারী, মেয়্যাটো অত খারাপ নাই রে। দেখতে সোন্দর, কথাও বলে মিঠা মিঠা। তর কথাও পুছ করলো, হঁ। আমি বুললম, সি হেথাকে নাই।

সুদাম তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বললে, ভালো করলি। মন চায় তো কুশমগুলকে যেয়্যা পিয়ালিকে আবার চা খিয়াই আসিস।

লজ্জা পেয়ে বিহারী বললে, তর যতো তামাশার কথা। সিটা কি হয় ?

সুদাম আর কথা না বাড়িয়ে হাসতে হাসতে ষ্টেশন ঘরের দিকে চলে গেল। রায়বাবুর বদলির হুকুম শুনে গিয়েছিল। আজই তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে রাখা ভালো।

ষ্টেশন-ঘর থেকে যখন সে ফিরে এলো তখন সন্ধ্যে ঘুরে গেছে। বিকেলের গাড়ীর কাজ মিটিয়ে ভরতলাল চলে গেছে তাসের আড্ডায়। রোজই এই সময় ঘণ্টা দু'য়েকের জন্যে সে চলে যায়। আজ যাওয়ার গরজ আরও বেশী। সুদাম গাড়ী থেকে নেমেই যদি টাকার তাগাদা আরম্ভ করে, এমন একটা আশংকা তার ছিল।

উনুনের কাছে ছেঁড়া মাদুরখানা বিছিয়ে গুটিসুটি হ'য়ে বসে গলা ছেড়ে গান গাইতে সুরু করেছিল বিহারী। সুদামকে ঘরে ঢুকতে দেখে গান থামিয়ে বললে, আজ একটুকু নিশা খিয়াবি সোদাম ?

সুদাম বললে, নাই। আখন গিরামকে যাবো একবার।

বিহারী অবাক হ'য়ে গেল। বললে, আখন আবার গিরামকে কি দরকার হ'ল ?

দরকার আছে আমার। পাসিঞ্জার গাড়ীটো ছাড়ি গেলে তাখন নিশা খিয়াবো।

সঙ্গে সঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো বিহারী। কৃতার্থস্বরে বললে, তবে

চা তিয়ার করি, খাইঁ যা—

সুদামের মতামতের অপেক্ষা না রেখেই বিহারী জল চাপিয়ে দিলে। এক গাল হেসে বললে, নাচনীর সঙ্গে তর দিখা হবে তো? উয়াকে বুলিস, বিহারী তমার কথা বুলছিল।

সুদাম হেসে বললে, বুলবো তর কথা।

বিহারীর মুখে হাসি আর ধরে না। বেশ খানিকটা দুধ ঢেলে দিলে সুদামের চায়ে।

উনুনের পাশে বসে চা খেতে খেতে অনেক কথাই মনে হ'তে লাগলো সুদামের। আর একটা রাত, একটা দিন। তারপরই নিশুতি রাতের অন্ধকারে গা মিশিয়ে মানীকে নিয়ে ঝাড়গ্রামের পথে যাত্রা। পরের দিন সময় হবে না। অথচ মৌলবনী ছেড়ে চ'লে যাবার আগে মানদার সঙ্গে একবার অন্তত দেখা ক'রে না গেলে মনে খেদ থেকে যাবে। কুশ-মণ্ডলে পিছুটান বলতে ওই একটা মাত্র মানুষ। কোনোদিন আর দেখা হবে কি না তাই বা কে জানে! একবার মাত্র দেখা করে আসা। তারপর বুড়িটার কপালে যা থাকে থাক। সুদাম দেখতে আসবে না হয়তো।

চায়ের ভাঁড়টা বাইরে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালে সুদাম। বললে, পণ্ডিত পুছ্ করলে বুলবি, পাসিঞ্জার গাড়ীর আগেই ফিরি আসবো।

মাথা নেড়ে বিহারী বললে, বুলবো। তর ভাবনা নাই, না আ'লেও আমি কাম চালাইঁ দিব।

তর নিশা খাওয়া?

এক গাল হেসে বিহারী বললে, উটাই তো বটে কথা।

সুদাম তাকে অভয় দিয়ে বেরিয়ে পড়লে।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত।

নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে গেছে সব কিছু। স্তব্ধ নিঝুম গ্রাম। দূরে সাঁওতাল বসতির ওদিক থেকে ভেসে আসছে বাঁশীর সুর। মহুয়ার গাছে গাছে সবে মুকুল দেখা দিতে সুরু করেছে। নৈশ হাওয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে তার মৃদু গন্ধ।

একা ঘরে বসে কত কি ভাবছিল পিয়ালি। তার যে এত দাম তা আগে

সে বুঝতে পারেনি। দাম উঠতে লাগলো দেহে যৌবনের জোয়ার লাগার সঙ্গে সঙ্গে। সবে এক কুড়িও বয়স হ'ল না, এরই মধ্যে তিনবার দল বদল। সারা জীবন পড়ে রয়েছে সামনে। আরও কত কী ভাঙাগড়া হবে কে জানে! কি রাজু অধিকারী, কি জটাধর সর্দার—সবাই তাকে খুশী ক'রতে পারলেই কৃতার্থ। তাদের সে সহ্য করতে পারে না। অথচ সহ্য করতে পারে না সুদামকেও। সুদাম তার উদ্দেশ্যে থুথু ফেলেছিল, সে কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারে না পিয়ালি। গায়ে অসহ্য তীব্র জ্বালা ধরে। সে জ্বালা কিছুতেই সে কমাতে পারছিল না। কিন্তু এবার কুশমণ্ডলে ফিরে এসে যে মুহূর্তে শুনলে নিতাই গোপের মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে, সেই মুহূর্তে কী এক পৈশাচিক আনন্দে যে তার এতদিনকার জমানো অপমানের জ্বালা ধুয়ে মুছে গিয়েছিল তা সে নিজেও এখনো ভাল করে বুঝে উঠতে পারেনি। মামীর অসুখের নাম ক'রে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে স্বজাতে বিয়ে দিয়ে তবে গাঁয়ে ফিরেছে নিতাই গোপ। খবরটা এখনো চারিদিকে ছড়িয়ে না পড়লেও কুশমণ্ডলের লোকের জানতে বাকী নেই। এইবার সুদামের মুরোদ যাচাই হবে।

দু'দিন ধ'রেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওই একটা প্রসঙ্গেই ভেবে চলেছে পিয়ালি। তার ওপর আজ জটাধর বাড়ীতে নেই। গাওনা ভালো হয়েছে। নগদ টাকাও কিছু হাতে এসেছে। মাতামদাস পারতপক্ষে মদ খায় না। তাকেও জোর ক'রে টেনে নিয়ে গেছে জটাধর। আর মানদা তো দু'দিন থেকেই বাড়ীছাড়া। আগের দিন সকালেই সে চ'লে গেছে বাপের বাড়ী। একা ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে ব'সে ব'সে কত কথাই ভাবছিল পিয়ালি। হঠাৎ বাইরে শুকনো পাতার ওপর কার যেন পায়ের শব্দ শুনে সে ভয় পেয়ে গেল। কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলে, কে বটে?

উঠোন থেকে সুদাম সাড়া দিলে।—আমি বটি সোদাম।

কারিগর!

তড়াক্ ক'রে উঠে পড়লে পিয়ালি। লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ক্ষীণ আলোর রশ্মি এসে পড়লো সুদামের মুখে।

বিস্মিত হ'য়ে পিয়ালি বললে, কবে ফিরলে কারিগর?

আজ। বুড়ীটো কুথাকে?

বাড়ী নাই।

নাই কেনে ?

পিয়ালি কয়েকমুহূর্ত চুপ ক'রে রইলে। তারপর বললে, ব্যস্ত হও কেনে কারিগর ? ঠাণ্ডা হাওয়া দিছে, ঘরকে আসি ব'সো।

অন্তত এই মুহূর্তে পিয়ালির সঙ্গে বাদবিবাদের মন ছিল না সুদামের। বললে, তাই চলো।

ঘরে ঢুকে মাদুর বিছিয়ে দিলে পিয়ালি। সুদাম একটু অবাক হ'ল। পিয়ালির সঙ্গে তার যে দু'দিন মাত্র দেখা হ'য়েছিল সে দু'দিনই মেয়েটার চোখে ছিল কটাক্ষের ছটা, কথায় ছুরির ধার, ওষ্ঠে মোহিনী হাসি। আজকের রূপটি তার সঙ্গে কিছুতেই যেন মেলে না।

মৃদু হেসে পিয়ালি বললে, কী দেখছো গো কারিগর ?

সুদাম সহজকণ্ঠে বললে, দেখলম তমাকে। ভিন্‌মেয়্যা বলি মনে হয় যে।

পিয়ালি বললে, মেয়্যালোক তাই বটে কারিগর। এক মেয়্যার হরেক রূপ গো।

সিটাই দেখলম।

ফিক্ ক'রে হেসে পিয়ালি ব'ললে, মরদে কি মেয়্যাছেলেকে চিনতে পারে ?

তেমন মরদ হ'লে পারে। হেসে বললে সুদাম।

তার মুখের হাসিটুকু পিয়ালির বুকে যেন অতর্কিতে একখানা ছুরির মতো হ'য়ে বিঁধে গেল। নিজেকে সামলে নেবার জন্যে কয়েকটা মুহূর্ত লাগলো তার। পরক্ষণেই মুচকি হেসে বললে, সি মরদ আর যিথানেই থাকুক, তমাকে বলবো নাই কারিগর। নেতাই গোপের মেয়্যার বিয়া যে হই গেল গো।

সামান্য একটা কথা মাত্র। সুদামের চোখের সামনে হঠাৎ যেন হাজার বাতির রোশনাই নিভে গেল।

চীৎকার ক'রে উঠ্‌লে সুদাম, মিছা কথা। মিছা কথা বুলছিস –

স্তব্ধ রাত্রির নীরবতাকে ভেঙ্গে খান্ খান্ ক'রে দিয়ে নৈশ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সুদামের কথাগুলো। ভয় পেয়ে গেল পিয়ালি। হিংস্রতা যে মানুষের চোখে জানোয়ারের চেয়েও ভয়ংকরভাবে ফুটে উঠতে পারে, পিয়ালি তা কোনোদিন দেখেনি। অস্ফুটস্বরে সে বললে, কারিগর, থির হই বসো—

সুদাম তার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দু'চোখ থেকে যেন আগুনের হলকা ছুটছে।

ব্যাকুলকণ্ঠে পিয়ালি বললে, মাথা গরম ক'রো নাই কারিগর। আগে শুনো—

হঠাৎ ক্ষিপ্ত পশুর মতো থাবা দিয়ে পিয়ালির একখানা হাত ধ'রে সুদাম বললে, ঠিক বুলছিস?

পিয়ালির গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। সুদামের কঠিন হাতের চাপে তার হাতখানা যেন অবশ হ'য়ে গেছে। মাথা নেড়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, মিছা বুলি নাই কারিগর।

পিয়ালির হাত ছেড়ে দিয়ে গায়ের চাদরখানা মুহূর্তের মধ্যে গায়ে জড়িয়ে নিলে সুদাম। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিনস্বরে বললে, চল্‌লম আমি।

পিয়ালি হঠাৎ দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দু'হাতে চেপে ধ'রলে সুদামের হাত। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলে সুদাম।

মরিয়ার মতো দরজার কপাটে পিঠ দিয়ে পথ রুখে দাঁড়ালে পিয়ালি। করুণ অনুনয়ে সে বললে, তমাকে আমি যা'তে দিব নাই কারিগর!

মুহূর্তের জন্যে থমকে থেমে গেল সুদাম। পরক্ষণেই কঠিন কর্কশস্বরে বললে, পথ ছাড় নাচনী। বিশ্বাসে আমার বিষ দিইঁছে মানী—উয়াকে আমি ছাড়বো নাই।

সুদামের হিংস্র আক্রোশের কথাগুলো শোনালো ঠিক যেন আর্তনাদের মতো।

কী পরিণতির আশায় পিয়ালি এই খবরটা সুদামের কানে তুলেছিল তা সে-ই জানে। কিন্তু এ অবস্থা হয়তো সে ভাবেনি। সুদামের এ মূর্তি সে সহ্য ক'রতে পারছে না। কেমন এক আচ্ছন্ন চেতনায় সে শুধু চোখ দু'টি মেলে আছে সুদামের দিকে। সুদামের একখানা হাত প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে সে বললে, কারিগর, তমার পায়ে পড়ি, নাচনী মেয়্যার ই কথাটো তুমি রাখো গো—

সুদাম তার দিকে একবার তাকালে। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। তারপর বললে, মেয়্যালোক কি এত বেইমানী করে নাচনী?

পিয়ালি সুদামের হাতখানা আরও জোরে চেপে ধরে বললে, সব কথা বুলবো তমাকে কারিগর। আখন থির হইঁ ব'সো।

প্রবল এক অবসাদে আচ্ছন্নের মতো ব'সে পড়লে সুদাম।

এ জগতের দেনা-পাওনা, হাসিকান্না আর আশা নিরাশার খেলা তার যেন এইমাত্র নিঃশেষে চুকে গেছে।

মামার বাড়ীতে পৌছে কিছুই বুঝতে বাকী ছিল না মানীর। এতবড়ো ষড়যন্ত্রের মধ্যে সে অসহায়। সারারাত জেগে মেয়েকে পাহারা দিয়েছে নিতাই। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে মানী। দোয়ারসিনীকে প্রথমটা আকুলভাবে ডেকেছে, তারপরে প্রাণ খুলে অভিশাপ দিয়েছে। একটা রাত গেল। একটা দিনও কেটে গেল চোখের সামনে। সেই রাতেই তার কপালে সিঁদূরের রেখা এঁকে দিলে নিতাইয়ের ঠিক করা পাত্র তুনীচাঁদ।

সব স্বপ্ন শেষ হ'য়ে গেল মানীর।

জামাই মেয়েকে রওনা ক'রে দিয়ে সেই রাত্রে পেটভরে হাড়িয়া খেয়েছিল নিতাই গোপ। দায়দায়িত্ব শেষ। এবারে মেয়ে তার যা খুশি করুক। প্রথম কয়েকটা দিন মানী ফুলে ফুলে কাঁদলে। তারপর কান্নাও গেল শুকিয়ে। সবসময়ই কেমন থমথমে ভাব। আর পাঁচজনকে তবু যাহ'ক সহ্য করে। সহ্য ক'রতে পারে না শুধু তুনীচাঁদকে। সে লোকটা সামনে এলেই বিবর্ণ পাংশু মুখে তাকায়। স'রে যাবার জন্যে ব্যাকুল হ'যে ওঠে।

তুনীচাঁদ মদির দৃষ্টিতে তাকায় মানীর দিকে। একরাশ বিস্ময় তার চোখে। টাকার জোগাড় হয়নি ব'লে এত বয়স পর্যন্ত ঘরে বউ আনতে পারেনি। কিন্তু বউ যখন এলো তখন তুনো উশুল দিয়েই এলো যেন। এ মেয়ের জন্যে মেয়ের বাপ কেন পাঁচকুড়ি টাকা পণ চাইবে না ? তবু কেন হঠাৎ তিনকুড়িতেই রাজী হ'ল তা আর এক রহস্য। মানীর দিকে তাকিয়ে সে বিভোর হ'য়ে যায়।

বিয়ের পরদিনই মানীকে নিয়ে তুনীচাঁদ চ'লে এসেছে তার কর্মস্থল গোরা সাহেবের কুঠিতে। কুঠির বাঁধা-মাইনের চৌকিদার তুনীচাঁদ। সেখানে তার দাপট অনেক। সে দাপট শুধু মানীর কাছেই বারবার প্রতিহত হ'যে ফিরে আসে।

লিঙ্কাই পাহাড়কে পূবে রেখে পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি চ'লে গেছে ময়ুরভঞ্জের দিকে। তারই ভেতর একটা ছোট টিলার ওপর গোরা সাহেবের

কুঠি। কুঠির পিছনে ঢালু খাদ। প্রায় চল্লিশ হাত নীচে এক টুকরো সমতল জায়গা। সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা ঝরণা। লোকে বলে 'বিষবরণী'। বিষবরণীর জল নীল। সারাবছর ধরে নীল জল ব'য়ে চলে ঝরণায়। ওই জলে অঢেল সম্পদ। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কপার সালফেটের অফুরন্ত সম্ভার ব'য়ে চ'লেছে বিষবরণী। অকৃপণ দানে ভরিয়ে চলেছে বিত্তলোভী মানুষের যক্ষভাণ্ডার। গোরা-সাহেবের পূর্ব্বপুরুষ খুঁজে বার করেছিল এই সম্পদকে। তারই জন্যে কুঠি, তারই জন্যে ফলাও ব্যবসা।

তুনীচাঁদ ভেবেছিল তার প্রতাপ দেখে দু'একদিনের মধ্যেই মেয়েটা সব কিছু ভুলে যাবে। কিন্তু তা হ'ল না। মানী রেঁধেবেড়ে দেয়, কথা বলে না। প্রশ্ন ক'রলে জবাব দেয় না। তুনীচাঁদের মদির আলিংগনের ভেতর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। মরিয়ার মতো আঁচড়ে কামড়ে দিয়ে অসহায় গলায় কেঁদে ওঠে, তর ঘর আমি ক'রবো নাই—ই—ই—

নিস্তব্ধ রাত্রির জমাট নৈঃশব্দ ভেঙে খান খান হ'য়ে যায়। সিদ্ধাই পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে মিলিয়ে যায় সেই তীক্ষ্ণ আর্ত চীৎকার। শোনবার কেউ নেই। কুঠি থেকে অনেক দূরে কুলি ধাওড়া। এ শব্দ সেখানে পৌছায় না। এই স্তব্ধ অরণ্য-প্রকৃতির মধ্যে মানীর কণ্ঠস্বর শোনে শুধু তুনীচাঁদ। সে হাসে। দ্বিগুণ শক্তিতে মেয়েটাকে বুকের ভেতর টেনে নিতে যায়। বাঘিনীর মতো গর্জন ক'রতে থাকে মানী। এলো-চুলের ঢেউ ভেঙে পড়ে বুকে পিঠে। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শেষে মেঝের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মানী।

তুনীচাঁদ তবু হাসে।

হাসতে হাসতে অসম্বৃতবেশবাস মেয়েটাকে দেখে। জোর ক'রে তুলে বসিয়ে দেয়। চীৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে মানী। বুকের কাপড় লুটিয়ে পড়েছে, চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়েছে মুখের ওপর দিয়ে। নিকষ-কালো গাল বেয়ে চোখের জল নেমেছে হু-হু করে। কালো পাথরের কোলে বিষবরণীর স্রোতের মতো। অদ্ভুত সে রূপ। বিভোর হ'য়ে যায় তুনীচাঁদ। প্রবল বিতৃষ্ণায় মানী থুথু ছিটিয়ে দেয় স্বামীর মুখে। মুখ মুছে নিয়ে তুনীচাঁদ দুর্দম আগ্রহে সেই মেয়েটাকেই বারবার ক'রে বুকে জড়িয়ে নিতে চায়।

কয়েকদিন অসহ্য রাগে মানীকে লাথিও মেরেছে। পরক্ষণেই মানীর চুলের মুঠি ধ'রে একটানে বুকের ভেতর নিয়ে এসে বিপুল আনন্দে জড়িয়ে ধরেছে। মানী প্রাণপণ শক্তিতে শুধু ছিটকে বেরিয়ে যাবার জন্যে মরিয়া হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু এরও শেষ হ'ল একদিন।

মানীর সেই নিঃশেষ আত্মসমর্পণের প্রথম দিনে প্রচণ্ড উল্লাসে আত্মহারা হ'য়ে গেল ভুনীচাঁদ। বারবার ক'রে দেখলে মানীর মুখখানা। পরিতৃপ্তির দিশেহারা আনন্দে বললে, বনের বাঘিনকে বশ করতে লারলম তো মরদ হ'লম কেনে বল্?

ভুনীচাঁদের আলিংগনের মধ্যে একটা নরম পাখীর মতো থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো মানী। এতদিন পরে ফুলে ফুলে কাঁদলে ভুনীচাঁদের বুকে মুখ গুঁজে।

পাহাড়ের গায়ে ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ আর আকাশমণির সরু সরু পাতায় ঝিরঝির শব্দ তুলে বিলি কেটে দিয়ে যায় রাতের হিমেল বাতাস। বিষবরণীর ওপাশ থেকে কী একটা রাতচরা পাখীর তীক্ষ্ণ কর্কশ ডাক ভেসে আসে প্রান্তরের ওপর দিয়ে।

মানী ফুলে ফুলে কেঁদেই চ'লেছে।

ভুনীচাঁদ পরিতৃপ্ত। এতদিনে বনের বাঘিনী তার বশ হ'য়েছে।

আলোর শিখা যত ক্ষীণই হ'ক, যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ তার গণ্ডীটুকুর বাইরে অন্ধকার শুধু মাথা কুটেই মরে। বারবার হার মেনে ফিরে আসে। তবু অন্ধকার একসময় আলোর দীপ্তিকে গ্রাস করে—যখন আলো নেভে।

সুদামের ভবিষ্যৎ-কল্পনার সদ্য জ্বলে-ওঠা শিখাটুকু নিভে গেল মানীর বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই। তার দায়দায়িত্বও চুকে গেছে সব। বিশ্বাসের গলায় ছুরি বসিয়েছে মানী। সুদামের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে গেছে মেয়েটা। হিসেব নিকেশ সব শেষ। আর ভয় কি?

কিন্তু চুলচেরা হিসেবেও যে অলক্ষ্যে কখনো একটা সূক্ষ্ম গরমিল থেকে যায় তার খোঁজ কে রাখে! সুদামও রাখেনি।

এক এক ক'রে দিন গড়িয়ে যেতে লাগলো। সুদাম আস্তে আস্তে

যেতে উঠলে মাতামদাসকে নিয়ে। মাতামদাস মরব্বা বাজিয়ে গান গায়। আর তালে তালে টিকারা বাজায় সুদাম।

মাতামদাস একদিন বললে, টিশনকে আর ফিরি যাবে নাই কারিগর ?

উহুঁ। নিরাসক্ত উদাসীন ভাবে জবাব দিলে সুদাম।

মহুয়া ফুলের উগ্র গন্ধে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত বাতাস ছিল ভারী হ'য়ে। ফুলের পাঁপড়ি শুকিয়ে মুকুলে মুকুলে ফল ধ'রতে সুরু ক'রেছে। মাঘ শেষ হ'য়ে ফাল্গুন এসেছে। ফাল্গুনও শেষ হয় হয়।

সুদাম হঠাৎ কারিগরের চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় সবচেয়ে খুশি হ'য়েছে বোধহয় মাতামদাস। জটাধর দলের অধিকারী। খেতে পরতে সে-ই দেয়। কিন্তু লোকটা সমঝদার নয়। সুদাম হ'ল আসল সমঝদার। দরদ বোঝে, মরম দিয়ে গান শোনে। সুদামের পীড়াপীড়িতে এরই মধ্যে দু'চারখানা নতুন গানও সে বেঁধে ফেলেছে।

প্রথম দু'চারদিন মানদা কিছু বলেনি। যত দিন যাচ্ছে, তত তার ভাবনা বাড়ছে। সব রাগ গিয়ে পড়ে পিয়ালির ওপর। রাগ হ'লেই অবিশ্রান্ত অকথ্য গালাগালি দিতে থাকে সুদামকে। একটা মাত্র ছেলে— তাও হুঁশ থাকে না রাগের মাথায়। পিয়ালিকেও গালিগালাজ করে। কিন্তু জটাধরের ভয়ে চেঁচাতে পারে না। পিয়ালির দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বিড়বিড় ক'রে বলে, উ সাপিন আমার সব সাধে বিষ ঝরাইছে, ডাকিন মাগীটো আমার সব খাবে গো—।

জটাধর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেছে। মাঝে মাঝে পিয়ালির দিকে চোখ পাকিয়ে বলে, সোদামকে চলি যা'তে বল্ পিয়াল।

ঝামটা দিয়ে ওঠে পিয়ালি।—আমার কী দায়? তমার ঘর, তমার বেটা, কথা বুলতে হয় তুমিই বলো না কেনে?

থতমত খেয়ে যায় জটাধর। পিয়ালি মনে মনে হাসে। তারপর কেন যেন বিষন্ন হ'য়ে ওঠে তার মুখ।

মাঝে হঠাৎ একদিন মৌলবনীতে গিয়েছিল সুদাম। জটাধরের খুশি ধরে না। কিন্তু তার মুখ কালো করে দিয়ে পরদিনই ফিরে এলো সুদাম। ভরতলালের কাছে পাওনা টাকাগুলো নিয়ে এসেছে সে। ঘরে বসে থাকলেও টাকা তো লাগে।

আরও কিছুদিন কেটে গেল।

চৈত্র শেষ। বৈশাখের আকাশঝরা আগুন নেমেছে পাহাড়ী উপত্যকায়। বসন্তের ছোঁয়ায় শালপলাশ আর কুসুমের ডালে ডালে সবুজের যে নতুন সমারোহ দেখা দিয়েছিল তা ঝলসে গেছে রোদের তেজে। সারাদিন ধ'রে মাটি পোড়ে, ঘাস পোড়ে। কঠিন পাথর পুড়ে পুড়ে আরও কঠিন হয়।

অনেকদিন পরে আজ হঠাৎ কী খেয়ালে মোষ দু'টোকে নিয়ে চরাতে বেরিয়ে পড়লে সুদাম। জটাধর অকুণ্ঠায় জমির পর জমি বন্ধক দিয়েছে, কিন্তু কী ভেবে যেন মোষ দু'টোকে বেচেনি। হয়তো বাকী জমিটুকু হাতছাড়া হবার আগে ওদের বেচবেও না।

বাঁধের ধারে ধারে একটু সবুজের ছিটেফোঁটা আছে। মোষ দু'টোকে ছেড়ে দিয়ে অনেক স্মৃতি জড়ানো সেই মুগরো ঝোপটার পাশে ব'সে পড়লে সুদাম। আজ আর ডুংরির মাথায় উঠলে না।

সবই সেই আগের মতো। সেই বনতুলসীর ঝোপ, সেই কেঁদ-করমের জংগল। নেই কেবল সেই একজন। টুকটুকে লাল শাড়ী পরা একটা নিকষ কালো ডাগর মেয়ে একমুখ হাসি নিয়ে আর কোনোদিন ওই পথটা ধ'রে তার জন্যে ছুটে আসবে না। সেই হাসি, সেই চাউনি মিলিয়ে গেছে চিরকালের মতো।

আপন মনে বিভোর হ'য়ে কতক্ষণ সে বসে ছিল তাও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ আকাশে নজর পড়তেই তার চমক ভাঙলো। কালো মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। শোঁ শোঁ করে বাতাস ছেড়েছে।

কালবোশেখী আসছে।

দমকা বাতাসে একরাশ ধুলোবালি আর শুকনো পাতা উড়ে গেল মুখের ওপর দিয়ে। যেখানে যত খড়কুটো আর ঝরাপাতা ছিল, সবাই মিলে উড়ছে, পড়ছে আর লুটোপুটি খাচ্ছে। এলাঘাসের শীর্ণ ডগাগুলোও যেন বেপরোয়া উল্লাসে মেতে উঠেছে।

চোখ খুলে হঠাৎ সুদামও যেন দিশেহারা হয়ে গেল। মোষ দু'টোর কথা আর মনে রইলো না। হঠাৎ উঠেই সে বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগলো।

বাড়ীর উঠোনে এসে যখন সে পৌঁছলো তখন বাতাস যেন আরও ক্ষেপে গেছে। ঘরের পেছনে প্রকাণ্ড হরতুকি গাছটা প্রাণপণে যুঝে চ'লেছে ক্ষ্যাপা বাতাসের সঙ্গে।

ঘরে ঢুকে গেল সুদাম। মানদা ঘরে নেই। নতুন মহুয়ার মদ মজুত

ছিল। ঢকঢক ক'রে খানিকটা মদ গলায় ঢেলে দিয়ে সে বাইরে এসে দাঁড়ালে। মানদা বাড়ীতে নেই, আর জটাধরতো এসময় থাকেই না। উঠোনে দাঁড়িয়ে কয়েকমুহূর্ত কী যেন ভাবলে সুদাম। তারপরই সোজা ঢুকে গেল পিয়ালির ঘরে।

পিয়ালি অঘোরে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের ঘোরে বেশবাস শিথিল হ'য়ে গেছে কখন। উনিশ কুড়ি বছর বয়সের যুবতী। ভরা বর্ষায় রকন বাঁধের মতো যৌবনের ঢল তার দেহে উপচে পড়ছে।

সুদাম নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। টাটকা মহুয়া মদের উগ্র ঝাঁজ এরই ভেতর একটু একটু ক'রে মাথায় চড়তে সুরু করেছে। কিন্তু পুরো বেসামাল করতে পারেনি তখনো।

টানা টানা চোখ দু'টো বুজে কেমন নিরুদ্‌বেগে ঘুমিয়ে আছে মেয়েটা। যেন একটা অবুঝ ছোট্ট মেয়ে।

সুদাম এগিয়ে গেল। হাঁটু মুড়ে বসে পড়লে ঘুমন্ত পিয়ালির পাশে। আস্তে আস্তে ডাকলে, পিয়ালি! পিয়ালি রে—

বেলা শেষের ঘুম। তায় আবার ঠাণ্ডা বাতাসের অংগরাগ। পিয়ালির সাড়া পাওয়া গেল না।

অবশেষে তার মাথায় আস্তে একটু ধাক্কা দিয়ে আরও জোরে ডাকলে সুদাম।—পিয়ালি রে!

আচমকা ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলে পিয়ালি। ভীষণভাবে ভয় পেয়েছে সে। ব্যস্তভাবে বললে, কী হল কারিগর?

কেমন এক অদ্ভুত হাসি হেসে সুদাম বললে, কালঘুম নাকি রে তর?

কেনে?

কেনে আর, কান পাতি শুন্—

পিয়ালি ততক্ষণে বেশবাস ঠিক করে নিয়েছে। কিছুই বুঝতে না পেরে সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালে সুদামের দিকে।

বাইরে তখন বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নেমেছে। খোলা দরজা দিয়ে এক ঝলক বাতাস এসে পিয়ালির মুখে চোখে যেন প্রলেপ দিয়ে গেল।

পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পিয়ালি বললে, আঃ—

সুদাম বললে, উঠ্ পিয়ালি।

কেনে গো ?

বাতাস বাওরা হইছে, আর বাওরা হই গেলম আমি। উঠ্, তু নাচ করবি, আমি বাজাবো—

পিয়ালি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলে সুদামের দিকে। তারপর একটু হেসে বললে, কত মদ খেয়্যাছো কারিগর ?

অনেক। একপেট মদ খা'লম আখন। তকেও খিয়াবো। তু নাচ করবি আর নাচ করবি নাচনী।

পিয়ালি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপর রূঢ়স্বরে বললে, তমার কথায় আমি তো নাচ ক'রবো নাই কারিগর।

সুদামের মুখ থেকে কোনো কথা বেরুলা না। হতভম্ব হ'য়ে বেশ কয়েকমুহূর্ত পিয়ালির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ তার হাত চেপে ধ'রে বললে, কেনে করবি নাই ?

হাত ছাড়ো কারিগর।

এক ঝটকায় হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালে পিয়ালি। সুদামও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রচণ্ড অপমানে তার মুখ কালি হ'য়ে গেছে।

পিয়ালি বললে, পয়লা তমার সঙ্গে যিদিনকা আলাপ হ'ল, সিদিনকা নাচনী নাচে থুক দিলে তা মনে পড়ে কারিগর ?

সুদাম কেমন অসহায়ের মতো বললে, তার লেগা আজ নাচ করবি নাই ?

পিয়ালি ফুঁসে উঠলে। প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞায় শানিত দৃষ্টি। বললে, সরম বাসো নাই কারিগর ? নাচুনীকে তমার এত হেলা, নাচনী তমার ভিটা খাবে, জমিন খাবে, সি নাচনীকে নাচ করাতে শখ হ'ল তমার ?

থাম্। জড়িতস্বরে ধমকে উঠলে সুদাম। এগিয়ে এলো পিয়ালির কাছে। খপ ক'রে আবার তার হাত ধ'রে বললে, নিশা খাবো, নাচ ক'রবো আমার খুশি। তু নাচ করবি কিনা বল—

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। জলের ঝাপটা বারবার এসে লাগছে চোখে মুখে।

হঠাৎ কেমন স্তিমিত হ'য়ে গেল পিয়ালির গলা। এবারে আর রূঢ়ভাবে হাত ছাড়িয়ে নিলে না। আস্তে সুদামের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বললে, আমার মন ভালো নাই গো কারিগর। আজ আমাকে মাপ দাও—

সুদাম আর একটাও কথা বললে না। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো

ঘর থেকে। পিয়ালি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো অভিভূত এক পাথরের মূর্তির মতো।

তার এতদিনকার জীবনটায় সুদাম যেন এক অলুক্ষুণে ঝড় নিয়ে এসেছে।

কালবোশেখীর তাণ্ডব অনেকক্ষণ আগে শেষ হ'য়ে গেছে।

অষ্টমীর চাঁদ উঠেছে লাখড়া ডুংরির ওপর দিয়ে। ফিকে জোছনা এসে প'ড়েছে হরতুকি পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

গাছের তলায় নিজের হাতে বাঁধা মাচার ওপর চুপ ক'রে শুয়ে ছিল সুদাম। ওপাশে দাওয়ায় ব'সে আপন মনে গান গাইছে মাতামদাস।

নেশার ঝিম চেপে বসেছে মাথায়। অবসাদে দেহ অবশ। তবু তারই ভেতর সমস্ত চেতনাকে সজাগ রেখে গানটা শোনবার চেষ্টা করছে সুদাম। এই গানটা শুনলে তার বুকে অসহ্য জ্বালা ধরে। অথচ এই গানটাই তার সবচেয়ে ভালো লাগে।

মাতামদাস গেয়ে চ'লেছে,—

ও সখি গো, যাইতে যমুনার জলে
দেখা হ'ল কদমতলে
কি কারণে চাইলো না মোর পানে॥
বাঁচি না প্রাণবন্ধু বিহনে।

সুদামের পীড়াপীড়িতে এ গানটা অনেকবার গেয়েছে মাতামদাস। কী মনে ক'রে আজ আপন মনে সে ওই গানটাই গাইছে তা সে-ই জানে।

বিভোর হ'য়ে গান শুনছিল সুদাম। হঠাৎ শুকনো পাতার ওপর খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে সে উঠে বসলে। এ সময় সাপেরা বেরোয়।

ঢুলুঢুলু চোখ দু'টো মেলে তাকালে সুদাম।

সাপ নয়, সাপিনী। কালনাগিনী পিয়ালি আসছে এগিয়ে।

পিয়ালি কাছে এলো। মৃদুস্বরে বললে, ঘরকে যাইঁ ঘুমাও কারিগর।

মদে চুর হয়ে আছে সুদাম। বললে, তর কি গরজ? যা ইথান থেকা—

পিয়ালি গেল না। মাচার কোণে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। একটু আগে সে-ও মদ খেয়েছে। দুঃখের আগুনে পোড়ে মন। আর মদের আগুনে পোড়ে দুঃখ। আজ দুঃখকে পোড়াতে সে মদ খেয়েছে

বোষ্টমের মতো।

মাতামদাস গাইছে,—

যার সনে যার পীরিতি
বুঝা আছে তার সনে।
ও আমি তারই লেগা বিনাশ হবো
কাঁদি তারই জন্যে॥
বাঁচি না প্রাণবন্ধু বিহনে।

পিয়ালি আপন খেয়ালেই একটু হেসে অস্ফুটকণ্ঠে বললে, মরণ!

কথাটা সুদামের কানে গেল। সে বললে, ই-গানটো তর বায়েন ভালো বুলে বটে।

সে কথার ধার দিয়েও গেল না পিয়ালি। বললে, তা বলুক। কিন্তুক কারিগর, যে মেয়্যা তমার লেগা ভাবলো নাই, তাকে তমার অত ভাবনা কেনে বলো তো?

সুদাম টলতে টলতে উঠে বসলে। তার সবচেয়ে বড়ো ক্ষতস্থানে প্রায়ই এমনিভাবে নির্মম আঘাত দেয় পিয়ালি।

ক্ষিপ্ত হিংস্র নেকড়ের মতো হঠাৎ পিয়ালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে তার গলা টিপে ধ'রলে সুদাম। কঠিন সে মুষ্টি। অর্তনাদের সময়টুকুও পেলে না পিয়ালি।

মরিয়ার মতো পিয়ালির দেহটাকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সুদাম বললে, বারবার কেনে এক কথা বুলিস, বল্—

পিয়ালির চোখ দু'টো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে সুদামের হাত দু'খানা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রেও সে পারলে না। মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ চোখ দু'টো থেকে প্রাণ-ভিক্ষার নীরব আকুতি ফুটে ওঠার পরই নির্জীবের মতো সে হাল ছেড়ে দিলে।

সামান্য কয়েকটা মুহূর্তের ঘটনা।

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেতেই পিয়ালিকে ছেড়ে দিলে সুদাম। পিয়ালির অবশ দেহটা ঢ'লে পড়লো সুদামের গায়ের ওপর। সব কিছুই যেন ওলট-পালট হ'য়ে গেল। অভিভূতের মতো পিয়ালিকে বুকে চেপে ধ'রে সুদাম বললে, কেনে তু আমাকে বারে বারে দুখ দিতে আসিস নাচনী?

বিকৃত অস্ফুটস্বরে পিয়ালি কি বললে বোঝা গেল না। তার সারা দেহ তখনো থরথর করে কাঁপছে। একবার মুখ তুলতে চেষ্টা করলে। পরক্ষণেই সুদামের কোলে মুখ গুঁজে ঝর্‌ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেললে।

একটা মুহূর্তের উত্তেজনায় কী যে ঘটে যাচ্ছিল তা তখনো যেন বুঝে উঠতে পারেনি সুদাম। বিড়বিড় ক'রে বললে, জানিস আমার দিমাগ ভালো নাই, তবু কেনে তর তামাশা? যদি মারি ফেলতম?

আঁচলে চোখ মুছে মুখ তুললে পিয়ালি। ধরা গলায় বললে, হয়তো বা ভালোই হত কারিগর। নাচনী মেয়্যার মরণই ভালো। নিলাজ তার নাম, নিলাজ তার পেশা। সি মেয়্যার মরণই ভালো গো।

দেখতে দেখতে ক'মাস পার হ'য়ে গেল গোরা সাহেবের কুঠিতে।

দুনীচাঁদ ছাড়া আর একটাও কথা বলবার লোক নেই। সেও সকাল হতেই নেমে যায় বিষবরণীর পাড়ে। দুপুর পর্যন্ত তদারকীর কাজ। মাঝে একবার এসে ভাত খেয়ে আবার চলে যায়। বিকেল বেলা ফিরে আসে ঘরে।

বিকেলের আলো দেখা দিতেই জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় মানী। পাহাড়ের ওপর থেকে ভেসে আসে বনতিতিরের ডাক। কিচির-মিচির করতে করতে উড়ে যায় পাখীর ঝাঁক। আর ফিরে যায় কুলি কামিনের দল। সারাদিন ধরে বিষবরণীর জলে লোহার জালি পেতে গোরাসাহেবের জন্যে তারা সম্পদ আহরণ করে। সম্পদ যায় গোরাসাহেবের কারখানায়। কুলিরা পায় মজুরী। সূর্য ডোবার আগেই মজুরী বুঝে নিয়ে দল বেঁধে ঝরণা পেরিয়ে ওপারের চড়াই পথটা ধ'রে চলে যায় তারা। তখন দুনীচাঁদের ছুটি।

দুনীচাঁদ রোজই ফেরবার সময় ঝরণার পাড়ে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে চোখ তুলে তাকায়। মানী তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে কুঠির জানলায়। খুশিতে চকচক্ ক'রে ওঠে দুনীচাঁদের মুখ। মানীও হাসে।

তারপর কালো পাখনা মেলে অন্ধকার নেমে আসে সিদ্ধাই পাহাড়ে। বাঘ ডাকে হয়তো বিষবরণীর ধারে কোথাও। হয়তো জল খেতে নেমেছে। প্রকৃতির স্নেহে দু'য়েরই সমান ভাগ। সারাদিন ধ'রে মানুষের হাতে তুলে দেয় অঢেল সম্পদ। রাত ভ'রে অরণ্যচারী পশুকে দেয় তৃষ্ণার জল।

আগে আগে বাঘের ডাক শুনে গা ছমছম ক'রতো মানীর। এখন অনেক গা সওয়া হ'য়ে গেছে। তবু হঠাৎ গর্জন শুনলে চমকে ওঠে এখনো। ভুনীচাঁদ আশ্বাস দিয়ে বলে, ডর কী রে? আমাকে না খুবলে তর গতরে থাবা লাগাতে পারবে নাই উ শালা—

মানী হেসে বলে, তা জানি।

রাত গভীর হ'তে থাকে। দু'চারটে কথা বল্‌বার পরই হয়ত নাক ডাকাতে সুরু করে ভুনীচাঁদ। মানীর চোখে ঘুম নামে না। একের পর এক স্মৃতি ভীড় ক'রে আসে সামনে। মনে পড়ে দোয়ারসিনীর মানত। কী ফল হ'ল তার?

মনে পড়ে আরও কত কথা, কত স্বপ্ন! ঘুমন্ত ভুনীচাঁদের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে মানী। ঘরে দু'খানা বল্লম, একটা টাঙ্গি। তাছাড়া আছে একখানা বিলিতি লোহার ছোরা। গোরা সাহেবের দেওয়া দামী ছোরাখানা ভুনীচাঁদের বড়ো শখের জিনিস। খাপশুদ্ধ ঝুলিয়ে রেখেছে দেওয়ালে।

সভয়ে চোখ বুজে থাকে মানী। গা শিরশির ক'রে ওঠে। একটা হিংস্র বাসনা পাক খেয়ে খেয়ে উঠতে থাকে মনের গভীরে। ওই শখের ছোরাখানাকেই লোকটার বুকে বসিয়ে দিয়ে রাতারাতি মৌলবনীতে চ'লে গেলে কেমন হয়? তারপর সুদামের হাত ধ'রে নিরুদ্দেশের পাড়ি। তখন কোথায় থাকবে নিতাই গোপের জেদ, কোথায় থাকবে বাগাল সমাজের অত দেমাক!······কিন্তু সুদাম যদি তাকে আর না নিতে চায়!

ভাবতে ভাবতে আর কূলকিনারা পায় না মানী। শেষে সব রাগ গিয়ে পড়ে সুদামের ওপর। সুদাম নামেই করালী সর্দারের নাতি। মরদ সে নয়। এতদিনে কিছুই কি সে শোনেনি? ঝড়ের মতো উড়ে এসে মানীকে এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার মুরোদ নেই তার?

আবার ভাবে, সুদাম হয়তো খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। আবার সেই আদিম হিংস্র ইচ্ছেটা মনের ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু নিশ্চিন্ত নির্ভয় ঘুমন্ত লোকটার প্রাণঢালা ভালোবাসার কথা মনে হ'লেই তার মন আবার কেমন উদাস হ'য়ে যায়।

রাত বাড়ে। প্রহরের পর প্রহর এগিয়ে চলে।

স্তব্ধ গম্ভীর সিদ্ধাই পাহাড়ের ওপর দিয়ে শন্‌-শন্‌ ক'রে ব'য়ে যায় বাতাস। রাতচরা পাখীদের কর্কশ চীৎকার চড়াই উৎরাইয়ের ওপর

দিয়ে প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে দূরে মিলিয়ে যায়।

মানীর চোখে ঘুম আসে না।

একটা মানুষের জন্যে এত জ্বালা! একটা মানুষের জন্যে বুকে এত দাহ!

এ বছর বর্ষা নামতে না নামতেই সুদাম যেন হঠাৎ অন্য মানুষ হয়ে গেল।

শেষ সম্বল ছ'খ'না জমি। এখনো তাতে জটাধরের হাত পড়েনি। সেই ছ'খানা জমি হঠাৎ কী অলক্ষ্যে মন্ত্রবলে যেন সুদামের পুরনো স্বপ্নটাকে সহসা নতুন করে জাগিয়ে তুললে। এই ক'মাস মহুয়ার মদ তাকে বেহুঁস করে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। বর্ষার মেঘ এসে নিমেষের হাত-ছানিতে সেই বেহুঁশ মানুষটাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিলে।

একরোখা জেদের ডানা মেলে জটায়ুর মতো করালী সর্দারের নাতি ঝাঁপিয়ে পড়লে জমিতে। জটাধরের থাবা থেকে এ মাটিটুকুকে বাঁচাতেই হবে।

বর্ষা এবারে এসেছে অঝোর ধারায়। অকৃপণ দানে নতুন প্রাণ দিয়ে গেল সমস্ত প্রান্তরের মাটিকে। সুতীব্র তৃষ্ণার মুখে ঢেলে দিলে উজাড়করা প্রাণরস।

অসুরের মতো খাটতে লাগলো সুদাম। এতটুকু ফুরসৎ নেই সারা-দিনে। যে টাকা ভরতলালের কাছ থেকে এনেছিল তার কিছু তখনো হাতে ছিল। বেপরোয়ার মতো সে টাকায় কামলা নিলে দু'জন। ভোর না হতেই বেরিয়ে যায় লাঙল আর মোষ দু'টোকে নিয়ে। ফিরে আসে সন্ধ্যেবেলায়। দুপুরে মানদা গিয়ে ভাত দিয়ে আসে ছেলেকে। তার হঠাৎ অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে। মুখে হাসি ধরে না আর।

সন্ধ্যেবেলায় বাড়ীতে ফেরবার পরও বিশ্রাম নেই সুদামের। মোষ দু'টোর সামনে জাবনা দিয়ে পরম আদরে তাদের গায়ে হাত বুলোতে থাকে। এক মুখ হাসি নিয়ে টেমি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে মানদা।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর জাবনা পেয়ে মোষ দু'টো দিশেহারা হয়ে মুখ ডুবিয়ে দেয়। তেল-চুক্‌চুকে শিঙের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে সুদাম বলে, জানিস মা, ইবারকা ধানটো উঠলে কাঁড়া দুটার শিঙের ডগা চাঁদির চাদরে মুড়ি দিব আমি।

মানদা তাতেই খুশি। বলে, তাই দিস বাপ। অনেক খোরাক-

জোগান দিছে অরা।

বর্ষার মেঘ করালী সর্দারের ভিটেয় হঠাৎ যে পরিবর্তন এনেছে তার হাওয়া লেগেছে শুধু যেন সুদাম আর মানদার গায়েই। জটাধর বা পিয়ালি যেন বাইরের মানুষ হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে অসুবিধে হয়েছে মাতাম-দাসের। তার গান শোনবার জন্যে সুদামের আজকাল একেবারেই গরজ নেই। গান গাওয়ার আগ্রহও তার অনেক কমে গেছে।

শ্রাবণ শেষ না হতেই রোপার কাজ শেষ হয়ে গেল। দু'মাসের ওপর হয়ে গেল মুখ তোলার অবকাশ পায়নি সুদাম। কিন্তু এখন অখণ্ড অবসর। তার দায়িত্ব চুকিয়ে দিয়েছে। বাকী যা করবার, তা করবে ধাত্রী জননী - মাটি।

সবুজের ঢল নেমেছে কুশমণ্ডলের প্রান্তরে। বাঁধের ধারে অমরী ফুলের ঝোপে ঝোপে ফুটেছে অজস্র ফুল। এলাঘাসের নরম নরম ডগাগুলো জ'লো বাতাসের দোলনায় দোল খাচ্ছে খুশি-মাখা ছোট্ট মেয়ের মতো।

রকন ডুংরির মাথায় উঠে চারিদিকে তাকায় সুদাম।

যতদূর নজর চলে সবুজ আর সবুজ। কত লাঙলের তাঁতে বোনা অন্তহীন সেই সবুজ আঁচলখানি অংগে তুলে নিয়েছে মাটি মা।

সুদাম বিভোর হয়ে তাকিয়ে থাকে।

এই সবুজের ভেতর থেকেই তো সেই অফুরন্ত স্বপ্নসাধ এসে বাসা বেঁধে-ছিল তার চোখের পাতায়। গ্রীষ্মের শেষে আকুল আগ্রহে দক্ষিণ-মৌসুমী মেঘের জন্যে সেই তৃষিত প্রত্যাশা। তারপর হঠাৎ একদিন লাখড়া ডুংরির ওপর দিয়ে উড়ে আসবে কালো কালো মেঘ। বিজলী চমকাবে আকাশ জুড়ে মাঠ-পাথার কাঁপিয়ে দিয়ে চলতে থাকবে মেঘের গর্জন। তারপর অঝোর ধারায় বৃষ্টি। নরম হবে কঠিন মাটি। তীক্ষ্ণ লাঙলের ফলায় উঠে আসবে ভিজে মাটির ডেলা। সদ্য ভেজা মাটি থেকে কেমন একটা নেশা ধরানো গন্ধ উঠে মিশে যাবে বাতাসে। তারপর ধান আর ধান। শরতের ঝির-ঝিরে বাতাসে নরম ডগাগুলো কাঁপবে, দুলবে, লুটোপুটি খাবে। মুখ গুঁজে ক্ষেতে কাজ করে চলবে সুদাম। দূরে আ'লের কাছে মহুয়া গাছটার নীচে এসে দাঁড়াবে মানী। গামছায় বাঁধা ভাত তরকারীর খোরা হাতে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে গাছের তলায়। তাকে দেখেও অবসর ক'রতে পারছে না সুদাম। শেষে হয়তো বিরক্ত হয়ে মানী গাল ফুলিয়ে বসে পড়বে

মাটিতে। সুদাম অগত্যা হাত ধুয়ে হাসতে হাসতে তার দিকে এগিয়ে যাবে। মানীর মুখে তখন ফুটবে হাসি। সুদাম গোগ্রাসে গিলতে থাকবে। ডু'টো ডাগর চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে থাকবে মানী।......

হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে এক অসহিষ্ণু জ্বালায় ছটফট ক'রে ওঠে সুদাম। সে স্বপ্ন স্বপ্নই। ভালোবাসার বুকে ছুরি মেরে কুল বাঁচাতে পালিয়েছে মানী। ভিন্‌-মরদের বুকে মাথা রেখে সেখানেও হয়তো আর এক বেইমানীর জাল বিছিয়েছে। মেয়েমানুষ কখনো মন দেয় না পুরুষকে। দেয় শুধু ওই ছলাকলাটুকু। বেইমানী সে করবে না তো ক'রবে কে? মাটি কিন্তু বেইমানী করে না। সুদাম তাকে ভুল করে ছাড়তে চেয়েছিল, সে তো কই সুদামের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে না! সে যে সবচেয়ে আপন জন। ভুমিজ যে তার আদি সন্তান। সে সন্তানকে মা কি ভুলতে পারে কখনো?

মানী গেছে যাক। মাটি থাকুক তার।

সব বুঝেও তবু যে কেন মন পোড়ে! না পাওয়ার দুঃখকে হয়তো সে কোনোদিন মানিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু পরাজয়ের গ্লানিটুকু মন থেকে কিছুতেই মুছতে চায় না। তাই হয়তো অনুরাগ হয়ে উঠেছে বিদ্বেষ। সে বিদ্বেষের জ্বালা বড়ো ভয়ংকর। অষ্ট-প্রহর জ্বলে তার আগুন। তারই লক্‌লকে শিখা থেকে বারবার নিজেকে জ্বালিয়ে নিয়ে মন নিজেও পোড়ে, অপরকেও পোড়ায়।

আগের বছর অঘ্রাণের শেষে দল খুলেছিল জটাধর। এ বছরের আশ্বিন গেল শেষ হয়ে। দেখতে দেখতে এক বছর হয়ে এলো প্রায়।

এক একটা ক'রে দিন যাচ্ছে আর জটাধরের চিন্তা বাড়ছে। ছোট বড়ো বায়না মিলিয়ে এ যাবৎ রোজগার খুব খারাপ হয়নি। তবু একটা পয়সা হাতে নেই! এরই মধ্যে চারখানা জমি নেমে গেছে টাকার জোগান দিতে। বাকী ছ'খানার ওপর সুদাম যে ভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তাতে হঠাৎ একটা কিছু ক'রতে সাহস হয় না। কিন্তু সময় হলেই পিয়ালি টাকা চাইবে। টাকা কোথায়? একটা বছর চালিয়েই দল তুলে দেবে করালী সর্দারের বেটা? ডাগর মেয়েটাকে নিরুপায়ের মতো হাতের মুঠো থেকে

ছেড়ে দিতে হবে এত তাড়াতাড়ি ?

ক্রমশঃ থমথমে হয়ে উঠতে লাগলো জটাধরের মুখ।

টুসুর আগে আর যাবার সম্ভাবনা নেই। পিয়ালির কিছু পাওনাও বাকী আছে। যদি এর মধ্যেই সে চেয়ে বসে ?

আপন মনেই দু'-চারদিন গজগজ ক'রে শেষে পিয়ালিকে সে বললে, সোদাম কিছু বুলছে তকে ?

চমকে উঠলে পিয়ালি। বললে, আমাকে তমার বেটা কী আবার বুলবে ? নাচনীকে সি তো থুক দেয়।

হাসি ফুটে উঠলো জটাধরের মুখে। সুদামের চেয়ে আগে পিয়ালিকে ভয় করতো বেশী। এখন তার বেশী ভয় সুদামকে। পিয়ালির কথায় একটু হাসি ফুটলেও মন থেকে ভয় গেল না। বললে, আখন তো জমিনের কাম কিছু নাই, ঘরকে বসি উ কী করছে বটে ?

আমি কি জানি ? ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দিলে পিয়ালি।

মিথ্যে কথার ঝাঁজ দিয়ে জটাধরকে থামিয়ে দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে পিয়ালি। সুদামের গতিবিধির কিছুটা অন্ততঃ জানে সে। হাটে হাটে জুয়া খেলে বেড়ায় সুদাম। মদের মতো এ নেশাও উত্তরাধিকারের পথে পাওয়া। সরকারী লাইসেন্স নিয়ে পাকা জুয়াড়ীরা হাটে আসে জুয়ার ছক নিয়ে। প্রলোভনের সর্বনাশা বেসাতি। হুমড়ি খেয়ে পড়ে আদিবাসী মানুষগুলো। সুদামকেও সেই নেশা চেপে ধরেছে।

আরও টাকা চাই তার। পিয়ালির কাছে গোপনে ধার করেছে জুয়ার ছক থেকে জিতে ফেরা যায় না। সুদামও জিততে পারেনি। এরই মধ্যে তিনচার কিস্তিতে ধার ক'রেছে পিয়ালির কাছে। এখন যদি শোধ দিতে নাও পারে, ধান উঠলেই সুদশুদ্ধ পিয়ালির টাকা মিটিয়ে দেবে এ আশ্বাসটা প্রতিবারই সুদাম দেয়। পিয়ালি হাসে। কোনো কথা না ব'লে দু'এক টাকা গুঁজে দেয় সুদামের হাতে।

লেনদেনের এই গোপণতাটুকু পাছে জটাধরের কাছে ধরা প'ড়ে যায়, তাই এত ভয় পিয়ালির।

জটাধর কিছুক্ষণ গুম্ হ'য়ে থেকে শেষে আসল কথাটা স্পষ্টভাবে বললে, অকে চলি যা'তে বল্ পিয়ালি। নয়তো তকেই একদিন যা'তে হবে বটে।

পিয়ালির মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, কেনে বলো তো ?

উ ঘরকে থাকলে আমাকে ট্যাকার জোগাড় ক'রতে দিবে নাই। তর স্বাথেই কথাটো বুলছি বটে।

জটাধরের বক্তব্যের উদ্দেশ্যটুকু স্পষ্ট হ'য়ে যাওয়ায় পিয়ালির গোপন ভয়টা মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেল। উলটে তীব্র শ্লেষ দিয়ে বললে, চুক্তির কালে ই কথা তমার মনে ছিল নাই অধিকারী? তাখুন তো ছাতি দিখালে, জবান দিলে গো!

থতমত খেয়ে গেল জটাধর। একটা বিড়ি ধরিয়ে ক'ষে দু'বার টান দিলে। তারপর বললে, জবান যা দিলম সিটা ঠিক আছে। জটা সদ্দারকে তু চিনিস নাই!

চিনাও না কেনে, বাধা দিছে কে?

ওপাশের ঘর থেকে মানদার গলা ভেসে এলো। কথাগুলো বোঝা গেল না।

জটাধর বিরক্তস্বরে বললে, বুড়ীটো চেঁচাইছে কেনে আবার?

সকাল থেকা জ্বর তাই চেঁচাইছে। তমার মতন মরদ উয়ার—তাই চেঁচাইছে।

প্রচণ্ড রাগ অনেক কষ্টে সামলে নিলে জটাধর। পিয়ালির মুখেও এই কথা! রাগের বদলে অনুনয়ের সুরে সে বললে, অমন কথা তর মুখে শুনতে লারবো পিয়াল। তর পায়ে মন বিকাই দিলম তাইতো বুড়ীর আগ।

পিয়ালি একটু হেসে ঘরে চ'লে গেল। জটাধর সেখানে ব'সে বিড়িটা শেষ ক'রে তারপর কোথায় যেন বেরিয়ে গেল।

সেদিনও ছিল হাটবার।

বিকেল প্রায় হ'য়ে এসেছে। জটাধরের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পর ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ ব'সে ছিল পিয়ালি। তারপর চোখ জড়িয়ে আসতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

মাতামদাস একটু আগে লাঠি ঠুক ঠুক ক'রতে ক'রতে হাটের দিকে রওনা হ'য়ে গেছে। আজকাল হাটের দিনে রাস্তায় ব'সে গান গেয়ে দু'চার পয়সা সে রোজগার করে। জটাধর তাতে আপত্তি করেনি।

ওঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে জ্বরের ঘোরে মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রছে

মানদা। এঘরে মাদুরে শুয়ে নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে পিয়ালি।

খুব ব্যস্তপায়ে উঠোনে এসে দাঁড়ালে সুদাম। মানদার গলার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালে একটু। অনেকক্ষণ থেকে একটু জল চেয়ে চেয়ে শেষে নির্জীব হাতে কপালে ঘা দিয়ে দিয়ে সে কাঁদছিল। সুদাম ঘরে ঢুকতেই ডুকরে কেঁদে উঠলে। তার মুখে জল দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সুদাম। সোজা উঠে এলো পিয়ালির ঘরের দরজায়।

বাইরে থেকে ডাকলে, পিয়ালি!

এক ডাকেই পিয়ালির ঘুম ভেঙে গেল। আজকাল সুদামের এই হঠাৎ আসা আর হঠাৎ ডাকার সঙ্গে সে বেশ পরিচিত হ'য়ে গেছে। শুয়ে থেকেই একটা হাই তুলে বললে, আজ আবার কী হ'ল কারিগর?

পাঁচটো ট্যাকা দে—

ট্যাকা নাই আর।

সুদাম ক্ষেপে গেল। একরাশ চাঁদির গহনায় ঝলমল ক'রছে পিয়ালির সর্বাংগ। নগদ টাকাতো পড়েই আছে।

অসহ্য রাগে চেঁচিয়ে উঠলে সুদাম।—তর্ ট্যাকা কি শুধবো নাই ভাবিস?

আড়মোড়া ভেঙে উঠে এলো পিয়ালি। সুদাম দরজা থেকে স'রে এসে দাওয়ার ওপর ব'সে পড়লে। টাকা না নিয়ে সে যাবে না আজ।

আস্তে আস্তে এসে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে পিয়ালি বললে, জুয়া খেলাকে এমন আর কত ট্যাকা তুমি উড়াবে কারিগর?

যত আমার খুশি। আমি তো ভিখ মাগ্‌লম নাই, হাওলাত লিব।

আর হাওলাত দিব নাই আমি।

আরও জোরে চেঁচিয়ে সুদাম একটা বিশ্রী শ্লেষ ক'রতে যাচ্ছিল, তার আগেই ওপাশের দাওয়া থেকে মানদার ভাঙা গলার তীব্র একটা ডাক কানে এলো তার।

সোদাম!

ফিরে তাকালে সুদাম। কাঁথা জড়িয়ে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মানদা। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। বিশ্রী একটা গালাগাল দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলে, কার ঠাঁই ট্যাকা চেছিস? লাজ নাই তর? মরণ হয় নাই রে—

সুদামও চেঁচিয়ে বললে, লিব, আমার খুশি ট্যাকা লিব। ঘরকে যা—

যাব নাই-ই-ই —।

তীক্ষ্ণ মর্মভেদী এক আর্তনাদ ক'রে দাওয়ার ওপর ব'সে পড়লে মানদা। সুদামও চমকে উঠলো সে শব্দে।

মানদা গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে বিকৃত স্বরে চেঁচাতে লাগলো।—ট্যাকা লিতে পাবি নাই তু। উ ট্যাকা লিলে হাতে তর কুঠ্‌ হবে, খসি পড়বে তর হাত। মর, তুইও মর, সব আপদ জুড়াই যাক আমার—

হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো মানদা। হঠাৎ এমন একটা অবস্থায় একটু ঘাবড়ে গিয়ে সুদাম পায়ে পায়ে স'রে যাচ্ছিল।

তীক্ষ্ণ গম্ভীর স্বরে পিয়ালি ডাকলে, থামো কারিগর। ট্যাকা দিব তমাকে।

কথাটা ব'লেই ঘরে ঢুকে গেল পিয়ালি। একটু পরেই বেরিয়ে এলো। হাতে দু'খানা পাঁচ টাকার নোট।

সুদাম ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছে। মানদা কাঁদছে আরও জোরে। স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে একবার ক'রে তাকিয়ে নোট দু'খানা সে ছুঁড়ে দিলে সুদামের দিকে। বললে, পাঁচ ট্যাকার জায়গা দশ ট্যাকা দিলম কারিগর। আরও লাগে, আরও দিব।

মানদা দাওয়ার ওপর লুটিয়ে পড়লে। পাগলের মতো মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে কী বলতে লাগলো তার এক বর্ণও বোঝা গেল না।

পিয়ালি আর একবার দেখলে মানদাকে। বিকারহীন দৃষ্টি। সুদাম টাকা নিয়েছে কি নেয়নি তাও দেখলে না। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে অসময়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে আজ।

সেইদিন সুদাম বেরিয়ে যাবার পর মানদা সেই যে ঘরে ঢুকে বিছানা নিলে, আর বাইরে আসেনি।

ঠিক তিনদিন পরে দুপুরবেলায় তার সব জ্বালার শেষ হ'য়ে গেল।

এতদিন পরে আজ শেষ সময়ে জটাধর এসে ব'সেছিল মানদার পাশে। সুদামও দাঁড়িয়েছিল চুপ ক'রে। ঘোলাটে চোখে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকালে মানদা। কথা বলবার ক্ষমতাটুকু সকাল থেকেই চ'লে গেছে। চিনতেও বোধহয় পারলে না কাউকে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত বিবর্ণ দৃষ্টিতে পিয়ালি দেখছিল মানদাকে।

মানদার শীর্ণ দেহটা শেষবারের মতো সমস্ত শক্তি দিয়ে বোধহয় মৃত্যুকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা ক'রলে। ধনুকের মতো হঠাৎ বেঁকে উঠেই তারপর সোজা হ'য়ে গেল হাড়সম্বল দেহটা। নিথর, নিস্পন্দ।

একটা অস্ফুট চীৎকার ক'রে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে পিয়ালি ছুটে নেমে এলো দাওয়া থেকে। সে তখন থর থর ক'রে কাঁপছে।

এ ঘরের দাওয়ায় ব্যগ্র উৎকণ্ঠা নিয়ে ব'সে ছিল মাতামদাস। পায়ের সাড়া পেয়ে ব্যস্তভাবে বলল, কে আসে?

আমি। কাঁপা গলায় পিয়ালি সাড়া দিলে।

কেমন আছে বটে?

নাই। সব শেষ হই গেল।

কোনোমতে মাতামদাসের প্রশ্নের জবাব দিয়েই ঘরে ঢুকে গেল পিয়ালি। আচ্ছন্নের মতো শুয়ে পড়লে মাদুরের ওপর।

দাওয়ায় ব'সে আপনমনে হা-হুতাশ ক'রতে লাগলো মাতামদাস। হায় রে, বড়ো দুখ্ ছিল বটে মানুষটোর। হায় হায়, বড়ো ভালো মেয়্যা ছিল গো—

ঘরের ভেতর থেকে পিয়ালি বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠলে।—তুমি থামো তো বায়েন।

থতমত খেয়ে চুপ হ'য়ে গেল মাতামদাস।

সন্ধ্যে ঘুরে যাবার পর বাড়ীতে ফিরে এলো জটাধর। মানদার নিঃসাড় দেহটাকে সবাই মিলে মাটির অনেক গভীরে শুইয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে উঠে এসে সে মানুসটা আর কোনোদিন কারও খেয়ালে বাদ সাধবে না।

তবু যেন কোথায় একটু অস্বস্তি। কী একটা খালি খালি ভাব যেন ঘিরে রয়েছে থমথমে বাড়ীটাকে।

পিয়ালির ঘরে মিটমিট ক'রে আলো জ্বলছে। আর সবদিক অন্ধকার। জটাধর কিছুক্ষণ ঝিম ধ'রে ব'সে রইলে। তারপর হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালে। যে গেছে তাকে নিয়ে ভাবতে নেই। পুরুষ মানুষ শোক ক'রবে কোন্ দুঃখে?

পিয়ালির ঘরে কিছু না কিছু মদ সবসময় মজুত থাকে। সোজা তার ঘরে ঢুকে ঢক্ ঢক্ ক'রে বেশ খানিকটা মদ গলায় ঢেলে দিয়ে জটাধর একটা বিকট চীৎকার ক'রে উঠলে। পিয়ালির দিকে একবার তাকিয়েই বাইরে

চ'লে এলো। মাত্তামদাসের কাঁধে এক চাপড় মেরে বললে, দু'চারখান গান বল্ বায়েন—

আজ গান থাক অধিকারী। মন মিজাজ ভালো নাই।

জটাধর আজ আর পীড়াপীড়ি ক'রলে না। খুঁটিতে হেলান দিয়ে ব'সলে। তারপর ভাঙা ভাঙা গলায় নিজেই গুন্-গুন্ ক'রে গান ধরলে।

ঘরের ভেতর শিউরে উঠলে পিয়ালি। এত শীতের মধ্যেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। মানদার কংকালসার চেহারা আর সেই ভয়ংকর ঘোলাটে চাউনি বারেবারেই ফুটে উঠছে তার চোখের সামনে। সেই সঙ্গে কানে এসে লাগছে জটাধরের ভাঙা গলার বেসুরো গান।

ঘরের দাওয়ায় দু'জন পুরুষ মানুষ ব'সে। তবু গা ছমছম ক'রতে লাগলো পিয়ালির। উঠে ব'সে সে কেমন বিবর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মিটমিটে লণ্ঠনটার দিকে।

সেদিন বিকেলে সুদামকে জুয়ার টাকা দেবার সময় সেই যে মানদা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই হিংস্র মূর্তিটাকে পিয়ালি কোনোমতেই ভুলতে পারছে না! কী আক্রোশ সে চাউনিতে! কী বিষ তার মুখের ভাষায়! শ্বাপদের চেয়েও হিংস্র হ'তে নারীই জানে। আর সেই ভয়ানক হিংস্রতার রূপ যখন ফোটে, তখন তার লক্ষ্যও থাকে নারী। মানদা আর পিয়ালির মধ্যে ছিল সেই সম্পর্ক। উপলক্ষ্য ছিল দু'টি পুরুষ। তবু তো সেই স্বামী আর পুত্রের হাতের মাটি তার জুটেছে। জীবনে সুখ না থাক, মরণে তার সম্মানটুকু তো কড়ায় গণ্ডায় সে আদায় ক'রে নিয়ে গেল!

পিয়ালি কী পাবে?

ভাবতে গেলেই অসহ্য এক বেদনায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। পিয়ালি তবু না ভেবে পারছে না। দুর্বিসহ সে যন্ত্রণা। মৃত্যুর পর কুলটা নারী আর ঝুমুর মেয়ের একই দশা। বেঁচে থাকতে নষ্ট মেয়ের রূপ যৌবনের দাম মেলে পাওনার চাইতেও বেশী। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে দেহ অপবিত্র। জটাধরও স্পর্শ করবে না তার মৃতদেহ। নষ্ট মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করা চলে। তার হাতের রান্না খাওয়া চলে না। তার যৌবনকে নিয়ে খেলা করা চলে, কিন্তু মৃত্যুর পর ছুঁলে পাপ নামে। তখন আসবে মেথর মুদ্দোফরাস। নষ্ট মেয়ের তারাই বাপ, তারাই স্বামী, তারাই সন্তান। শেষ গতি তাদেরই হাতে।

সবই জানে পিয়ালি। সব ঝুমুর মেয়েই জানে। কিন্তু নিজের কথা চিন্তা করবার অবকাশটুকু এলেই ছুটে পালিয়ে যেতে চায় মনটা। পিয়ালিরও তাই হয়েছে। মহুয়ার মদ, হাড়িয়া আর দেহ-লীলার অবারিত উৎসবের কোলাহলে সব চিন্তা, সব ভাবনা তলিয়ে যায়। নগদ টাকার ঝমঝমানি আর অজস্র অলংকারের জৌলুষে চোখ যায় ধাঁধিয়ে। নেশার মাতন লাগে দেহে মনে। অন্য কথা ভাববার অবসর কোথায় ?

মানদা আজ সেই অবসরটুকুই ক'রে দিয়ে গেল পিয়ালিকে। চোখের জল আর বাধা মানে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো পিয়ালি।

বাইরে তখন জটাধরের বিকৃত সুরের গান আরও একটু উঁচু পর্দায় উঠেছে।

সময় ব'সে থাকে না।

মানদার কথা ভুলতে জটাধরের বেশী সময় লাগেনি। পিয়ালিও প্রায় ভুলে গেল। তারই আগ্রহে ক'দিন পরে আবার সুরু হ'য়ে গেল নাচ গানের আসর। জটাধর হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে।

মাঠপাথারে ধান কাটার কাজ সবে আরম্ভ হ'য়েছে। ক'দিন থেকে এক গোপন অভিসন্ধি নিয়ে গোলোক দত্তের কাছে ঘুরঘুর করছিল জটাধর। দু'একদিনের মধ্যেই সুদাম হয়তো জমিতে নামবে। তার আগে কাজ হাসিল করা চাই। সন্ধ্যের অন্ধকারে গোলোক দত্তের দোকান ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে কাজ হাসিল হ'য়ে গেল। বাকী রইলো শুধু রকন ডুংরির নীচে বাঁধের গায়ের জমি দু'খানা। বাকী জমির ধান একটা আন্দাজ পরিমাণের ওপর কিনে নিলে গোলোক দত্ত। হিসেব করলে আধাআধি দামও হয়তো নয়। তবু এক সঙ্গে এতগুলো টাকা! দিশেহারা পাগলের মতো বাড়ীর দিকে রওনা হ'য়ে গেল জটাধর।

পিয়ালি তখন সবে রান্না শেষ করে হাত ধুতে বাইরে এসেছে। তাকে সে সময়টুকুও দিলে না জটাধর। খপ্ করে তার হাত ধ'রে বিপুল উচ্ছ্বাসে বললে, আয় পিয়াল।

কুথাকে যাবো ?

নাচ করবি। মনমোহিনী নাচ দিখাবি বটে আজ। দিল খারিজ করি

দিব তর পায়—

বলতে বলতেই পিয়ালিকে এক রকম ঝাপটে ধ'রে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে গেল জটাধর। কেরোসিনের টেমিটা তুলে ধরে লোলুপ দৃষ্টিতে পিয়ালির সর্বাংগ সে যেন লেহন করতে লাগলো।

সমস্ত ব্যাপারটুকু এত চকিতে ঘটে গেল যে, পিয়ালি কোনো কথা বলবার সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি। জটাধর তাকে ছেড়ে দিতেই তীব্র ঝাঁজালো কণ্ঠে সে বললে, ছি ছি ছি, হায়া ন'ই তমার? একটা মাসও হ'ল নাই বউ মরেছে, তাও—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলে না জটাধর। কর্কশ হাতে আচমকা পিয়ালিকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বললে, চুপ যা উ কথা। যিটা যাবার সি যাক। তু থাকলেই আমার হ'ল পিয়াল।

এক ঝটকায় জটাধরের আলিংগন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো পিয়ালি। ভুরু কুঁচকে বললে, নাচনী মেয়্যাকে চেরকাল বাঁধি রাখে, এমন মরদ তুমি?

লয় কেনে? কী অভাব তর বটে?

সি তুমি বুঝবে নাই অধিকারী। যেমন আছো তাই থাকো।

সহসা বিষণ্ণ হ'য়ে গেল জটাধরের চোখ। নির্জীবস্বরে বললে, তু আমাকে ছাড়ি যাবি পিয়াল?

কেনে যাবো নাই? কী বাঁধন তমার বলো?

জটাধর কয়েক মুহূর্ত পিয়ালির দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখলে। পরক্ষণেই দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে পিয়ালিকে আবার বুকে টেনে নিয়ে বললে, বেশ কথা, বাঁধন নাই মানলম। কিন্তুক আজ নাচ চাই পিয়াল—মনমোহিনী নাচ।

বিদ্যুৎরেখার মতো এক ঝিলিক হাসি ফুটে উঠলো পিয়ালির ওষ্ঠে। বললে, মনমোহিনী নাচের যে মনভুলানি দাম লাগে গো।

এক আসুরিক খুশিতে চকচক ক'রে উঠলো জটাধরের লোলুপ চোখ দু'টো। একটানে কোমর থেকে নোটের তাড়া বা'র ক'রে পিয়ালির চোখের সামনে তুলে ধ'রে বললে, দিব, যাই দাম চাস আজ দিব তকে। লাগাই দে তর মনমোহিনী নাচ—

হতবাক্ হ'য়ে গেল পিয়ালি। বললে, অসময়ে এত ট্যাকা!

হা হা ক'রে হাসতে লাগলো জটাধর। পিয়ালির দেমাকে তাহ'লে ঘা পড়লো আর একবার। কথার কোনো জবাব না দিয়ে সে ঘরের

কোণ থেকে টেনে আনলে একটা বোতল। আধাআধি মদ নিজের গলায় ঢেলে দিয়ে বোতলটা এগিয়ে দিলে পিয়ালির দিকে। কৃতার্থের মতো এক-গাল হেসে বললে, সব ট্যাকা তর। সব কিছু তর পায় দিব নাচনী। তু খালি মাতাইঁ রাখ অধিকারীকে।

পিয়ালি মদের বোতলটা সরিয়ে রাখলে। জটাধর একটু অবাক হ'য়ে বললে, নিশা খাবি নাই!

পিয়ালি গম্ভীর স্বরে বললে, আপন গরজে খাবো। আর কতখানি জায়গা জমিন বেচা করি দিলে অধিকারী?

মুহূর্তের জন্যে জটাধর একটু চমকে গেল। তারপর বললে, ইবার জমিন দিলম নাই। ধানগুলা সব বেচা করি দিলম রে।

সঙ্গে সঙ্গে এক প্রবল আতংকে পিয়ালির মুখখানা কালো হ'য়ে গেল। রুদ্ধকণ্ঠে সে বললে, আমার লাগি ই তুমি কী ক'রলে অধিকারী?

অপ্রতিভভাবে জটাধর বললে, কেনে, কী হ'ল বটে তাতে?

পিয়ালি কথা বলতে পারছে না। ভয়ে, বিস্ময়ে, বেদনায় তার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। বললে, গতরের অক্ত জল করি ধান তিয়ার করেছে কারিগর। তাকে তুমি একটুক মায়া ক'রলে নাই?

জটাধর হঠাৎ বিকট এক চীৎকার ক'রে উঠ্‌লে, থাম্‌। বিবর্ণ মুখে দু'পা পিছিয়ে গেল পিয়ালি। জটাধরের মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে বিশ্রী ক্রূরতার চাউনি। দাঁতে দাঁত পিষে কর্কশ গলায় সে বললে, তকে আনা করাইঁছে কে বল্‌? কে তর খোরপোষ কবুল করছিল বল্‌?

থর থর ক'রে কাঁপছে পিয়ালি। অস্ফুটকণ্ঠে বললে, তুমি বটে।

জটাধর মদের বোতলটা তুলে এগিয়ে দিলে পিয়ালির সামনে। তারপর নরমস্বরে বললে, হঁ, কথাটো বটে মনে থাকে। লে, মদ খা—

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আধ বোতল মদ গলায় ঢেলে দিলে পিয়ালি। জটাধরের চাউনি আরও কোমল হ'য়ে এলো। পিয়ালিকে আচমকা কাছে টেনে নিয়ে বললে, করালী সর্দারের বেটা আমি। তর অধিকারী আমি। অপরের দুখ্‌ দরদ তকে ভাবতে হবে নাই নাচনী।

পিয়ালি কোনো জবাব দিলে না।

জটাধর তাকে ছেড়ে দিয়ে বললে, আজ বায়েন হবো আমি। তিয়ার হ—

পিয়ালি আর প্রতিবাদ ক'রলে না। শিথিল আঁচল শক্ত ক'রে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে সত্যি সত্যিই তৈরী হ'য়ে গেল। টিকারা নিয়ে মাটিতে বসে পড়লে জটাধর। অনভ্যস্ত হাতের এলোমেলো বাজনার শব্দে তলিয়ে গেল একটু আগেকার সবকিছু।

টিকারায় কাঠি দিয়েছে জটাধর। বিশ্রী শব্দ তুলে বাজছে যন্ত্রটা।

কুড় কুড় তাক, কুড় কুড় তাক, কুড় তাক—

কুড় তাক, কুড় তাক, কুড় কুড়-ড়-ড়—

নাচতে আরম্ভ ক'রলে পিয়ালি।

অসম ছন্দ, বিসম তাল। কিন্তু নাচ তাতে থামলো না। অংগ হিল্লোলে হঠাৎ এসেছে উদ্দামতার প্লাবন। বেহুঁশ হ'য়ে যাচ্ছে পিয়ালি। জটাধরের সামনে আজ সে ধরা পড়ে গেছে। তাই আজ সবটুকু কদর্যতা দিয়ে লোলুপ মানুষটাকে আর সবকিছু ভুলিয়ে দেবার বাসনায় সে অধীর হ'য়ে উঠেছে।

জটাধরও ক্ষেপে গেছে। দ্রুত হাতে কাঠি চালিয়ে যাচ্ছে টিকারায়। পিয়ালির নাচে এত পুলক এর আগে সে অনুভব করেনি। কিছু খেয়াল নেই পিয়ালির। লুটিয়ে পড়েছে বুকের আঁচল। ঝুমুরণীর তাতে লজ্জার কারণ নেই। কামনার মদির হাসি ফুটে ফুটে উঠছে ওষ্ঠের প্রান্তে। চোখের কোণে ঝিলিক মেরে যাচ্ছে কটাক্ষের বিদ্যুৎচমক।

তাল কেটে গেল একবার। খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়লে পিয়ালি। নেশার মৌতাত ছেয়ে গেছে সর্বাংগে। মাটিতে বসে পড়েই দমকে দমকে হাসতে লাগলো সে।

বিকট স্বরে বাহবা দিয়ে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলে জটাধর। তারও পা টলছে। পিয়ালি জটাধরের কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে তারই গায়ে গড়িয়ে পড়লে।

আদিম বন্যতার দিশেহারা অভিষেক।

কত রাত হয়েছে কেউ জানে না। আবার নাচ সুরু হ'ল। আবার বাজনা। জটাধর সর্দার এতদিনে বুঝতে পেরেছে পিয়ালি তারই।

বাতিটা কখন নিভে গেছে।

আচমকা ঘুম ভেঙে যেতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো পিয়ালি।

সর্বাংগে অসহ্য ব্যথা। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে।

খোলা দরজা দিয়ে খানিকটা চাঁদের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে ঘরে। সেই আলোর আবছা আভায় দেখা যাচ্ছে জটাধরকে। একেবারে বেহুঁশ। বাজনাটা তুলেও রাখেনি। তার ওপর একটা পা তুলে দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে লোকটা।

পিয়ালি এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলে। তারপর এগিয়ে গেল ঘুমন্ত জটাধরের কাছে। বুক কেঁপে উঠলো একবার। হাত যেন আর এগুতে চায় না। তবু মরিয়ার মতো জটাধরের কোমরে গোঁজা নোটের বাণ্ডিলটা নিয়েই সে দমবন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত বসে রইলো। জটাধর টের পায়নি। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পিয়ালি।

শরীর টলছে। পা যেন অবশ। উঠোনে নেমে আবার দাঁড়ালে কয়েক মুহূর্ত। শীতের কুয়াশার ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো যতটুকু আসে তাতেই উঠোনটা ঝক্‌ঝক্ করছে। হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে ব'য়ে গেল এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। শেষবারের মতো আর একবার দাঁড়িয়ে জটাধরের নাক ডাকার শব্দ ভালো করে শুনে নিয়েই দ্রুতপায়ে সে এগিয়ে গেল মানদার ঘরের দিকে। সুদাম আজকাল সেই ঘরে শোয়।

নিঃশব্দে দরজার ঝাঁপ খুলে অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়লে পিয়ালি। আন্দাজে হাতড়াতে গিয়ে হাত ঠেকলো সুদামের গায়ে। আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে চাপা গলায় পিয়ালি ডাকলে, কারিগর! ও কারিগর!

কয়েক ডাকের পরই ঘুম ভেঙে গেল সুদামের। ধড়মড় করে উঠে বসে বললে, কে?

পিয়ালি ফিসফিস করে বললে, আমি গো।

নাচনী! বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে গেছে সুদাম।

কাছেই কোথায় একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠলো। রাত্রির জমাট নিঃস্তব্দতা কিছুক্ষণের জন্যে কেটে গেল। চমকে উঠলো পিয়ালি। যদি জটাধর জেগে যায়!

কুকুরের ডাক মিলিয়ে গেল। আবার রাত্রির নৈঃশব্দ। নিবিড় আবেগে সুদামের হাত ধ'রে পিয়ালি বললে, কারিগর, ট্যাকা লিবে?

সুদামের মনে হ'ল সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু পিয়ালির স্পর্শটুকু তো স্বপ্ন নয়। এমনকি মেয়েটার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে।

পচাই মদের উগ্র ঝাঁজালো গন্ধ এসে নাকে লাগছে।

পিয়ালি ব্যস্তভাবে বললে, কথা বলো কারিগর। ট্যাকা লিবে কিনা বলো—

দিবে কে?

আমি। অনেক ট্যাকা আছে আমার। তুমি ইখান থেকা চলি যাও, যেথাকে খুশি জমিন করো, আবাদ করো, তারপর—

বাকী কথাটুকু তাকে বলতে দিলে না সুদাম। এক ঝটকায় পিয়ালির হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বললে, তর ট্যাকা আমি লিব নাই।

পিয়ালি হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলে না। ঘন অন্ধকারে তার মুখের ভাবটুকু সুদাম দেখতে পায়নি। ঘরে আলো থাকলে দেখতে পেত এক অসহায় আর্তি ফুটে উঠেছে গরবিনী ঝুমুর মেয়ের চোখে।

সুদামও যেন অনেকটা আচ্ছন্নের মতো হ'য়ে গেছে। নরম স্বরে বললে, তর কী হ'ল বটে নাচনী?

একটা অবসন্ন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো পিয়ালির বুক থেকে। আস্তে আস্তে বললে, আমার মরণ হইছে কারিগর। ঝুমুর মেয়্যাকে এমন মরণে কেনে তুমি মারলে গো!

হতবিহ্বলের মতো সুদাম বললে, আমি মারলম তকে!

ধরা গলায় পিয়ালি বললে, তা জানো নাই? কেনে আমার মনটা তুমি এমন করি ছিনাই নিলে কারিগর!

মুহূর্তের মধ্যে কী এক প্রবল শক্তির উত্তেজনায় বিহ্বল হ'য়ে গেল সুদাম। উষ্ণ রক্তস্রোত দ্বিগুণ বেগে ব'য়ে চ'লতে লাগলো শিরায় শিরায়। হাতের মুঠোয় ঝুমুর মেয়েটার নিটোল যৌবনসম্ভার। এমন যৌবন মানীরও ছিল। মন দিয়েও সে ধরা দেয়নি। ঝুমুর মেয়ে মন দিয়েছে। ধরাও দিয়েছে নিঃশেষে। আগুন জ্ব'লে উঠলো সুদামের মাথায়। এক টানে পিয়ালিকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে আচ্ছন্নের মতো সে বললে, তকেই আমি লিব রে নাচনী।

দিশেহারা আবেশে থরথর ক'রে কাঁপছে পিয়ালি। জড়িত অস্ফুট স্বরে বললে, সকলকে ভুলাই আমি। তমার কাছে নিজে ভুল্‌লম কারিগর!

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল। নীরব, নিঃশব্দ দু'টি মানুষ।

তারপর গাঢ়স্বরে সুদাম বললে, বেইমানী করি যে গেল যাক, তকে সাঙা

করি আমি ঘর বাঁধবো পিয়াল।

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে পেলে পিয়ালি। মুহূর্তে নিজেকে সুদামের আলিগংন থেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে বললে, ছি—

তার ধিক্কারের শব্দটা যেন সুদামের বুকে একটা তীরের মতো বিঁধে গেল। সে বল্‌লে, ছি বুলছিস কেনে ?

উকথা বুলতে নাই কারিগর। শুনো নাই বায়েন একটা গান বুলে, 'কুলবতীর কুল ভাঙ্গিলে লহে না আর জোড়া ?' কুলভাঙা মেয়্যাকে বিয়া সাঙার কথা কি বুলতে আছে কারিগর ? ছি ছি—

আমি করবো আমার খুশি—

ধরা গলায় পিয়ালি বললে, যখন কুল ভাঙে নাই, মান ভাঙে নাই, তখন কেনে দেখা দিলে নাই কারিগর ?

সুদাম কি বলবে বুঝতে পারছিল না। এই একটা বছরে কত বিচিত্র রূপ নিয়ে পিয়ালি তার সামনে এসেছে। কোনোটার সঙ্গে অন্য রূপের মিল নেই।

সুদাম উঠে গিয়ে কেরোসিনের টেমিটা জ্বেলে দিলে।

ছোট ঘরে কেঁপে কেঁপে নাচতে লাগলো আলোর শিখাটুকু। সে আলোতেও পিয়ালির চোখের জল দেখতে অসুবিধা হ'ল না সুদামের।

আলো জ্ব'লে উঠতেই বিবর্ণ ভয়ার্ত স্বরে সে বললে, বাতি নিবাও কারিগর। ট্যাকা লিবে তো লাও, আমি যাবো।

সুদাম বললে, আমাকে ট্যাকা দিতে তর শখ কেনে বল্‌ ?

শখের কি মাথামুণ্ড থাকে কারিগর ! তুমি লিবে কিনা বলো—

লিব। তকেও লিব সঙ্গে।

পিয়ালি এগিয়ে এলো। পচাই মদের গন্ধ আর একবার এসে লাগলো সুদামের নাকে। আবেশে, আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছে পিয়ালি। বললে, আমাকে বিশ্বাস যাবে কারিগর ? নাচুনী বলি ঘিন্না ক'রবে নাই বলো—

সুদামের মুখে কোনো কথা নেই।

উত্তেজিত কাঁপা গলায় পিয়ালি বললে, চল কারিগর, তমার সঙ্গে যাবো। ঘর বাঁধতে যত ট্যাকা লাগে দিব, সব গহনা বেচা করি দিব আমি।

বিমূঢ়ের মতো সুদাম তার দিকে তাকিয়ে রইলো। এও কি ঝুমুর মেয়ের আর এক ছলা কলা ?

শোঁ শোঁ ক'রে বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে বাইরে। পাতায় পাতায় সাড়া জাগছে। দূরে কোথায় একসঙ্গে ডেকে উঠলো গোটাকয়েক কুকুর।

হঠাৎ কী হ'ল তা সুদামই জানে। বিষাক্ত সাপকে না জেনে জড়িয়ে ধরবার পর ভুল ভাঙলে প্রচণ্ড আতংকে মানুষ যেমন ক'রে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ঠিক তেমনি ক'রে পিয়ালির গায়ে একটা ধাক্কা মেরে কঠিন স্বরে সে বললে, কে চায় তকে? যা—

বিমূঢ়ের মতো পিয়ালি ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো সুদামের দিকে। তারপর বললে, সি মেয়্যাটো আন্ মরদের ঘর করে গো কারিগর। মেয়্যাছেলের মুখের কথায় যি মরদ ভুলে তার বড়ো বোকা আর নাই।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে উন্মনা হ'য়ে গেল সুদাম। মৌলবনী ষ্টেশনের সেই আলো-আঁধারী সন্ধ্যাবেলার ছবিটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। মানীর সেই চাপা কৌতুকের হাসি, সেই ভয়, সেই আকুলতা। ডাগর চোখে সেই অভিমান। কানে এসে যেন বিঁধছে টুসুর ছড়া।

ছুটু ছুটু গাছগুলি কতই যতন ক'রবো।
তুই রমণী চিন্তামণি তকেই বিহা ক'রবো॥

আতংকে ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছিল মানীর মুখ। সুদামের অমংগল আশংকায় কী গভীর মমতায় সে সুদামের মুখ চেপে ধ'রেছিল সেদিন!

অবসন্নের মতো সুদাম বললে, তর ঘরকে যা নাচনী, আমার ট্যাকার দরকার নাই।

নাচনীকেও দরকার মিটি গেল?

হঁ, গেল।

পিয়ালি কোনো কথা বলতে পারলে না। টপ্ টপ্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার গাল বেয়ে। সুদাম অপ্রতিভের মতো কাছে এগিয়ে এসে বললে, কী হ'ল তর?

রুদ্ধ কান্নার আবেগে ধরাগলায় পিয়ালি বললে, কারিগর, তমার পারা ভূমজ অক্ত তমার নাচনীর গায়েও আছে গো। তমার বাপের পারাই নেশা আমার বাপেরও ছিল। তমার জ্বালা আর কেউ বুঝতে লারবে কারিগর—কিন্তুক আমি বুঝি—।

সুদাম কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দমকা হাওয়ার মতো পিয়ালি বেরিয়ে গেল।

রাত তখনও অনেকখানি বাকী। আলো নিবিয়ে দিয়ে সুদাম আবার শুয়ে পড়লে। কিন্তু সারারাত চোখের পাতায় ঘুম আর নামলো না। ভোরের আলো ফুটতেই সে বেরিয়ে চ'লে গেল মোষ দু'টোকে নিয়ে। আড়-চোখে পিয়ালির ঘরের দিকে একবার তাকিয়েছিল। দরজা বন্ধই আছে।

কে জানে মেয়েটার মনে কী ছিল!

বাকী রাতটুকু পিয়ালিও ঘুমুতে পারেনি।

এক অন্ধ আবেগে সে সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল। সুদামের স্পর্শে হঠাৎ জেগে উঠেছিল তার মধ্যে আর এক পিয়ালি। সুদামের গেছে জমি, আর তার গেছে ইজ্জত। প্রথম যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই তার বাবা তাকে তুলে দিয়েছিল এক অধিকারীর হাতে। তারপর থেকে এই জীবন। বাসনার উদ্দাম স্রোতে তার ভেতরকার সেই বালিকা মেয়েটা কবে যে মুখ লুকিয়ে স'রে গিয়েছিল, পিয়ালি নাচুনী তার খবর রাখেনি। সেই মেয়েটা এতদিনে সুদামকে নিয়ে নতুন ক'রে তার স্বপ্নজাল বুনতে আরম্ভ ক'রেছিল। তবু সুদামের কাছে সে যে এত সহজে ধরা প'ড়ে যাবে তা ভাবেনি। কিন্তু তাইই হ'ল। ঝুমুর মেয়ে কাঁদাবে জোয়ান মরদকে। অথচ জোয়ান মরদই কাঁদালে তাকে! পিয়ালি নাচুনীর চোখে জল! একবার নয়—দু'বার। তবু তাকে অবজ্ঞায় ঠেলে দিয়েছে সুদাম। এ জ্বালা ভোলা যায় না। পিয়ালি যদি ভোলে তবে সে কিসের মেয়েমানুষ?

সেই জ্বালায় জ্ব'লে ওঠা চোখে ঘুম কি আর আসে?

সারারাত ছটফট ক'রে কাটালে পিয়ালি। ঘরে এসেই টাকার গোছা জটাধরের পাশে রেখে দিয়েছিল। কী মনে ক'রে উঠে গিয়ে টাকাগুলো লুকিয়ে রেখে এলো।

যখন জটাধরের ঘুম ভাঙলো পিয়ালি তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সকালের রোদ লুটিয়ে পড়েছে চারিদিকে।

মাতামদাস ভোরবেলায় উঠে আপন মনেই গান গাইছিল। জটাধর শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ শুনলে। তারপর আড়মোড়া ভেঙে বাইরে এসে বসলে।

একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো পিয়ালি। নোটের বাণ্ডিলটা জটাধরকে দিয়ে বললে, লাও তোমার ট্যাকা।

টাকা নিতে গিয়ে একটু ঘাবড়ে গেল জটাধর। পিয়ালির চোখ দু'টো লাল। মুখ থমথমে। শ্রাবণের মেঘ যেন থমকে থেমে আছে সে মুখে।

জোর ক'রে একটু আপ্যায়িতের হাসি হেসে জটাধর বললে, হুঁ, নাচ করলি বটে রাতকে। উ নাচ আমি ভুলবো নাই রে!

পিয়ালি কোনো জবাব দিলে না।

জটাধর ভয়ে ভয়ে বললে, নিদ হয় নাই তর?

পিয়ালি সে কথারও জবাব দিলে না।

জটাধর আমতা আমতা ক'রে বললে, কী আবার হ'ল বটে? নাঃ, তকে আমি এতদিনকেও বুঝতে পেলম নাই রে পিয়াল!

পিয়ালি উঠোনে নেমে গিয়েছিল। সেখান থেকেই বললে, সব নাই বা বুঝলে অধিকারী! মেয়্যালোকের সব কথা মরদকে বুঝতে নাই।

জটাধর বোকার মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো। পিয়ালি চ'লে গেল গোয়াল ঘরের দিকে। মানদা মারা যাবার পর থেকে তার ছাগল আর মুরগীগুলোর তদারক পিয়ালিই করে।

ছাড়া পেতেই মুরগীগুলো কক্ কক্ করতে করতে ছুট দিলে। পিয়ালি ফিরে এলো জটাধরের কাছে। গম্ভীর গলায় বললে, কারিগরের মিহনতের ধান তো বেচা করি দিলে, গর্দানা রাখতে পারবে?

কেনে পারবো নাই? করালী সর্দারের বেটা বটি আমি।

জটাধরের দম্ভোক্তি শুনেও পিয়ালি বিচলিত হল না। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, করালী সদ্দারকে দেখলম নাই। তবে তার বেটাকেও দেখলম, নাতিকেও দেখলম। গতরে অক্তই আছে, তেজ নাই গো।

জটাধর রেগে গিয়ে বললে, তেজ নাই বটে আমার?

নাই। শান্তগলায় পিয়ালি বললে, থাকলে তমাদের ই হাল হ'ত নাই অধিকারী।

জটাধরের দম্ভকে নিমেষে ঝল্সে দিয়ে একটা আগুনের হল্কা যেন ব'য়ে গেল।

জটাধর নীরবে শ্লেষটা হজম করলে। তারপর বোকার মতো খানিকটা হেসে বললে, ভিন্ হাল হ'লে তকে তো আনা করা হ'ত নাই রে পিয়াল!

পিয়ালি ভুরু কুঁচকে বললে, তুমি না আনা করলে আমার ক্ষতি হ'ত বটে?

থতমত খেয়ে জটাধর বললে, আবার উ কথা কেনে ?

পিয়ালি হাসলে। মনে পড়ে গেল আগের রাতের কয়েকটা মুহূর্তের কথা। ধারালো হাসির একটা ঝিলিক মেরে সে বললে, আমার পাওনা মিটাইঁ দাও অধিকারী। আর থাকবো নাই তমার দলকে।

মুহূর্তে কালো হ'য়ে গেল জটাধরের মুখ। এত দিয়েও মেয়েটাকে সে কখনো খুশী ক'রতে পারেনি। তবু খুশী করবার ঝোঁক সামলাতে পারে না।

ব্যস্ত হ'য়ে সে নেমে এলো উঠোনে। নিরীহের মতো বললে, বারবার উ কথা বলি দুখ্ দিস কেনে ? কি তর চাই বল্—

দিবে তুমি ?

হঁ, দিব।

আর একবার ধারালো হাসির ঝলক ফুটে উঠলো পিয়ালির চোখে। কাছেই একটা ছাগলছানা রোদে দাঁড়িয়েছিল। কী খেয়ালে সেটাকে তুলে বুকে জড়িয়ে নিয়ে জটাধরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে। তারপর বললে, লগদ ট্যাকায় আমার সাধ মিটি গেইঁছে। আমি জমিন চাই।

অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলো জটাধর। ঝুমুর মেয়ে টাকা চায়, গহনা চায়, মদ চায়—এই হ'ল দস্তুর। অধিকারীর কাছে কবে কোন্ নাচনী আবার জমি চেয়েছে !

পিয়ালি মুচকি হেসে বললে, কি গো, দিতে লারবে ?

জটাধরের আহত পৌরুষ রুখে উঠলো। বললে, বেশ, জমিনই তকে দিব। আমার পাওনা কী, সিটা কবুল কর্।

ছাগলছানাটাকে চুমু খেয়ে মদির হাসির মাদক মিশিয়ে পিয়ালি বললে, ঝুমুর মেয়্যার কাছকে যা আছে সব তো তমাকে দিলম অধিকারী। যা তমার পাওনা তাই দিব। বাঁধা হইঁ থাকবো তমার ঘরকে।

খুশিতে চকচক ক'রছে জটাধরের মুখ। আচমকা পিয়ালির বুক থেকে ছাগলছানাটাকে কেড়ে নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিলে সে। তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো অবোধ প্রাণীটা। তাকে লুফে নিয়ে আবার পিয়ালির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হা হা করে হেসে উঠলে জটাধর।

মাতামদাস তখন যে গানটা গাইছিল, সেটা এর আগেও সে অনেকবার গেয়েছে। কিন্তু আজ সকালে জটাধরের কানে গানটা অসহ্য লাগলো।

মাতামদাস গাইছিল,—

সই, সাধে বাদে আগুন জ্বেলেছি।
আদর করে কালনাগিনী
বুকে নিয়ে খেলেছি॥

হঠাৎ বিকট স্বরে ধমক দিয়ে উঠলে জটাধর।—অ্যাই শালা বায়েন, গান থামা। শালা গান বুলছে স্তাখ্ না! আর গান নাই তর গলায়?

পিয়ালি খিলখিল ক'রে হেসে উঠলে।

এক সর্বনাশ! খেলায় মেতে উঠেছে পিয়ালি। হারজিতের এক ভয়ানক খেলা। ভরা যৌবনে ঝুমুর মেয়ে কি হার স্বীকার ক'রতে পারে?

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বোঁচকা-বুঁচকি বেঁধে জটাধর রওনা হ'য়ে গেল। কথা রইলো, পরের দিন সুযোগ মতো পিয়ালিও চ'লে যাবে ঘাটশিলায়। তারপর জমি কেনাবেচার দলিল। মরণ-পাখার শেষ ঝাপটানি।

জটাধর রওনা হ'য়ে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'য়ে বসে রইলো পিয়ালি। মাতামদাস কী একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। অন্যমনস্ক-ভাবে তার জবাব দিয়ে সে আস্তে আস্তে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

দুপুর গড়িয়ে গেল তবু সুদামের দেখা নেই। এক অজানা আতংকে পিয়ালির গা ছমছম করতে লাগলো। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া তার অনেকদিনের অভ্যেস। কিন্তু আজ তাও হ'ল না। চুপ ক'রে বসে রইলো দাওয়ায়। মানদার সেই পেঁয়াজ ক্ষেতের ওপাশে ঝাঁকড়া নিম গাছটার ওপর বসে একটা বনকৌয়া আপন মনে ডাবছে। হরতুকির ডালে ব'সে পাল্লা দিয়ে ডেকে চলেছে দু'টো ঘুঘু। শীতের পড়ন্ত দুপুরের আলোয় সবে বিকেলের বিষণ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে। ব'সে থাকতে থাকতে পিয়ালির চোখের পাতায় কখন যেন একটু ঝিম নেমেছিল। হঠাৎ উঠোনে ভারী পায়ের শব্দ শুনেই ঝিমটুকু কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গলা শুকিয়ে গেল তার।

সামনে দাঁড়িয়ে সুদাম।

তারই পাশে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস ছাড়ছে ভীষণ-দর্শন মোষ দু'টো। তাদের চেয়েও যেন ভীষণ দেখাচ্ছে সুদামকে।

কঠিন স্থির দৃষ্টিতে পিয়ালির দিকে তাকিয়ে ছিল সুদাম। শুকনো গলায় পিয়ালি বললে, কী দেখছো কারিগর?

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড গর্জন ক'রে উঠলে সুদাম।—কাল রাতকে কেনে ছিনালী ক'রলি আমার সঙ্গে?

পিয়ালির চোখ দু'টো মুহূর্তের জন্যে জ্ব'লে উঠলো। বললে, ছিনালী করা আমার পেশা, তা জানো নাই তুমি?

জানি। আরও জানলম তকে দেখি। বখরা কত পেছিস্ বল্—

উদ্ধতস্বরে পিয়ালি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, বখরা কেনে লিব? আমার পাওনা নাই? তমার দুখ্ দেখি মনে দয়া হ'ল তাই ভিখ্ দিতে সাধ বাসলম। তুমি নিলে নাই, ব্যস, মিটি গেল। আবার কিসের কথা?

সুদাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হ'য়ে তাকিয়ে রইলো পিয়ালির দিকে। তারপর কঠিন ঝাঁজের সঙ্গে বললে, খালি ট্যাকা দিবারই মন ছিল তর, আঁ?

তবে আবার কী? শাণিত উদ্ধতস্বরে পিয়ালি বললে, ছি কারিগর, লাজ নাই তমার? বাপের ঝুমুরণীর সঙ্গে বেটার কী সম্বন্ধ? ছি—

সুদামকে আর একটা কথাও বলবার সুযোগ না দিয়ে ঝ'ড়ো হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে পিয়ালি।

সুদাম দাঁড়িয়ে রইলো হতভম্বের মতো। ছাড়া পেয়ে মোষ দু'টো চলে গেল বাড়ীর পেছন দিকে। অবসন্নের মতো আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসলে সুদাম। তার আশা আকাংক্ষাটুকু দ'লে মুচ্ড়ে ভেঙে দিয়েছে জটাধর সর্দার। চারখানা জমিতে ধান কাটতে নেমেছে গোলোক দত্তের লোকেরা। সঙ্গে পাহারাদার। মরিয়ার মতো বাধা দিতে গিয়েছিল সুদাম। গোলোক দত্তের লোকেরা তাকে হটিয়ে দিয়েছে।

দেহের রক্ত জল ক'রে ধানের শীষে শীষে লক্ষ্মীর আসন পেতেছিল সুদাম। তাই বেচে দিয়ে হাত পেতে টাকা নিয়েছে জটাধর। সেই টাকাই হয়তো ভিক্ষে দিতে এসেছিল পিয়ালি।

রক্তচোখে পিয়ালির ঘরের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো সুদাম। জটাধর ফিরুক। তারপর শেষ মীমাংসা। জটাধর সেদিন পার পাবে না। রেহাই পাবে না পিয়ালিও।

অবশিষ্ট দু'খানা জমির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লে সুদাম। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। জটাধর যেখানেই থাক—ফিরে আসবে। তার আগে কাজ শেষ করবার জন্যে সে মরিয়া হ'য়ে উঠেছে।

সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যায় ঘরের দাওয়ায় ব'সে মুড়ি খাচ্ছিল সুদাম। লাঠি ঠুকঠুক ক'রতে ক'রতে মাতামদাস এগিয়ে এলো। সুদামকে লক্ষ্য ক'রে বললে, নাচনী তো ভোরের বেলা চলি গেল গো।

অবাক হ'য়ে গেল সুদাম। বললে, কুথাকে গেল ?

মাতামদাস বললে, গেল বটে অধিকারীর কাছকে। তমার জমিন জিরাত ভিটা মাটি সব বেচা করি দিছে অধিকারী। ই ভিটা আখন আর তমার নাইগো কারিগর।

কবে বেচা করলো ? খরিদ করছে কে ?

সুদামের কর্কশ স্বরে হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল মাতামদাস। সামলে নিয়ে বললে, খরিদ করছে তমার পিয়ালি।

এক ঝলক তপ্ত বাতাস যেন ব'য়ে গেল গায়ের ওপর দিয়ে। সারাদিন প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর একপেট খিদের মুড়ি ক'টি কোঁচড় থেকে মাটিতে ফেলে দিলে সুদাম। তারপর কেমন এক অসহায় নির্জীব কণ্ঠে বললে, আগে ই কথা কেনে বুল্‌লে নাই গো বায়েন ?

উয়ারা যড়্ করলো কখন তাতো আমি জানতে পা'লম নাই কারিগর! আগে জানলেই বা তুমি কী করতে বলো ?

দাঁতে দাঁত পিষে সুদাম বললে, গলা টিপি খতম করি দিতম নাচনীকে।

জটাধর আর পিয়ালির শলা-পরামর্শের যতটুকু কানে গিয়েছিল তার ওপর নিজের অনুমানের রঙ চড়িয়ে সেদিনকার কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে ব'লে গেল মাতামদাস। সুদামের মুখে কোনো কথা নেই।

একটু থেমে মাতামদাস বললে, একটা কথা বলি কারিগর! পিয়ালির মন পড়ি আছে ইখানকে। আজ হ'ক, কাল হ'ক, একদিন সে ফিরবে।

সে কথায় কোনো সাড়া না দিয়ে সুদাম উঠে দাঁড়ালে। মাতামদাস বললে, একেবারে বোবাকালা হ'লে কেনে গো ?

সুদাম বললে, তমার নাচনী যদি ফিরি আসে তো তাকে একটা কথা

বুলো বায়েন। তার কেনা মাটির পর সোদাম একটা রাতও কাটায় নাই।

থতমত খেয়ে মাতামদাস বললে, আঁই রে, কী বুলছো ?

হাঁ। কুশমণ্ডলের মাটি ছাড়ি চলি যেছি আমি।

মাতামদাস হা হা ক'রে উঠলে।—ইটা কি কথা হ'ল কারিগর ? আমার কথা শুনো তুমি। পিয়ালি ফিরুক, তুমি তার ঝুমুরিয়ার পাট কবুল করো। তমার জমিন, তমার ভিটা এক কথাকে ফিরি আসবে তমার হাতে। বুড়াটা যা খুশি করে করুক তারপর।

নাই। গর্জন করে উঠলে সুদাম।—করালী ভুমজের নাতি ভিখ্ মাগবে নাই বায়েন।

দমকা বাতাসের মতো ঘরে ঢুকে গেল সুদাম। কাঁথা কম্বল আর গামছাখানা দ্রুত হাতে জড়িয়ে নিলে। মাচার তলায় হাঁড়ির মধ্যে লুকানো ছিল কয়েকটা টাকা। হাঁড়িটা বা'র ক'রে নিয়ে এলো বাতির সামনে। টাকার সঙ্গে উঠে এলো আর একটা চকচকে জিনিস !

কয়েকমুহূর্তের জন্যে সুদাম যেন বিহ্বল হ'য়ে গেল।

মানীর কানের সেই ঝুম্‌কো !

কেরোসিনের মিটমিটে আলোতেও চক্‌চক্ ক'রছে রূপোর ঝুম্‌কোটা। রকন ডুংরির ওপর বনতুলসীর ঝোপের আড়ালে ব'সে নিজের হাতে ঝুম্‌কোটা খুলে সুদামের হাতে দিয়েছিল মানী! ছলা কলায় কি এতটুকু কমতি ছিল গোপের মেয়েটা ?

ঝুম্‌কোটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েও পারলে না সুদাম। টাকার সঙ্গে কোমরে গুঁজে নিলে সেটাকে।

মাতামদাস থতমত খেয়ে চুপ ক'রেই ব'সে ছিল। তার সামনে এসে সুদাম বললে, কিছু দোষ নিও নাই বায়েন। কানা মানুষ তমাকে একা ফেলি যাবো ভাবি নাই। ঘরকে মুড়ি আছে, জল আছে, খাওয়া ক'রো।

শুকনো গলায় মাতামদাস বললে, তুমি আর ফিরবে নাই কারিগর ?

নাই। একটা পেটের খোরাক আমার যিথানকেই হ'ক জুটবে। তমার ঝুমুরণীর কামাই করা ভিটামাটি থাকছে। বুড়া থাক, ঝুমুরণী থাক, তুমি থাকো—খালি আমি থাকতে লারলম ই ভিটায়।

মাতামদাস নির্জীবকণ্ঠে বললে, ভুমজ হ'লেই কি এত গোঁয়ার হ'তে আছে কারিগর ?

সুদাম একটু হাসলে। শান্ত গলায় বললে, ভুমজের অক্ত বড়ো ঘন গো বায়েন। গোঁ না নামলে কী করি বলো?

লাঠির ডগায় পুঁটলিটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে সে বড়ো রাস্তার অন্ধকারের ভেতর মিলিয়ে গেল।

বহুদিন পরে মৌলবনী ষ্টেশনের জনকোলাহল আর ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে আবার নতুন ক'রে অনুভব করতে লাগলো সুদাম। প্রাণভরে স্বাদ নিতে লাগলো কৌতূহলী শিশুর মতো।

বিহারী একাই এখন দোকানের বয় কারিগর সব। আপ্যায়ণ ক'রে বসালে সুদামকে। তাড়াতাড়ি এক ভাঁড় চা এনে দিলে।

সুদাম বললে, নাচনী আজ সকালকে গাড়ী চাপলো নাকি রে?

পিয়ালির কথা তুললেই বিহারী শতমুখ। আজ সকালেই স্টেশনে এসেছিল পিয়ালি। বিহারীর সঙ্গে কথাও বলেছে। কিন্তু সুদামের মেজাজ বুঝতে না পেরে অমন সরস প্রসংগটা তুলতে তার সাহস হচ্ছিল না। সুদামের মুখ থেকে কথাটা বেরোতে না বেরোতেই এক নিঃশ্বাসে তার কথাগুলো বলা হ'য়ে গেল।

বিহারী বললে, আঁই রে বাপ, সক্কাল বেলাকে তর ঝুমুরণী তো হাজির। চা মেঠাই কেনা করি উধারকে বসি খা'তে লাগলো। পুছাইলম, কুথাকে যাওয়া হবে বটে? জবাব দিল নাই। পাসিঞ্জারে চাপি চলি গেল পূবে।

সুদাম বললে, যমের ঘরকে যেছে, তাই কিছু বলে নাই।

বিহারী আপশোষ ক'রে বললে, তর দিমাগ বটে বড়ো চড়া। সারা পরগণাকে পিয়ালির এত খাতির, কিন্তুক তর মন উঠলো নাই আজও!

সুদাম আর কথা বাড়ালে না। একটা বিড়ি ধরিয়ে জোরে জোরে টানতে লাগলো। অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে। নিঃসাড় নিস্তব্ধ ষ্টেশন। প্ল্যাটফরমের এ প্রান্ত ও প্রান্ত জুড়ে দু'নম্বর লাইনের ওপর নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে একখানা মালগাড়ী। পোষ-মানা কলের অজগর। ষ্টার্টার-সিগ্‌ন্যালের রক্তচক্ষুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিরুপায়ের মতো প্রায় দু'ঘণ্টা ধ'রে হাই তুলছে ইঞ্জিনখানা।

বিড়িতে ক'ষে একটা দম দিয়ে সুদাম বললে, গ্যাখ্‌ বেহারী, কলের এল্‌জিনও কেমন দাপটে বশ। মেয়্যাছেলের মন কিসে বশ হয় জানিস?

একগাল হেসে বিহারী বললে, ভালো ভালো গহনা দিবি, খিয়াবি, পিন্ধাবি তবে তো বশ।

সুদাম বললে, নাই রে! মেয়্যাছেলেও বশ হয় দাপটে—টাঙির মুখে।

এ তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর অবসর বিহারীর বড়ো একটা জোটেনি। তাছাড়া সুদাম তার চেয়ে বিজ্ঞ। বিনা প্রতিবাদে সুদামের কথায় সে সম্মতি জানালে।—হক্ কথা বটে বুলছিস্, হঁ।

গাড়ীর ঘণ্টি হয়েছে।

বিহারী চায়ের কেটলি চাপিয়ে দিয়ে ভাঁড় সাজাতে লাগলো। সুদামের অখণ্ড অবসর। দোকান থেকে নেমে পড়লে প্ল্যাটফরমে। পুরনো যারা আছে তাদের সকলের সঙ্গেই দেখা করতে হবে।

পরের দিন সকালের গাড়ীতেই রওনা হয়ে গেল সুদাম।

গিধনির শাল-জংগলের কাজ না জোটে তো ধলভূমগড়ের খাদান আছে। কোথাও না কোথাও কাজ জুটবেই।

গাড়ী ছাড়ার আগে চা বিক্রী বন্ধ করে দিয়ে ছুটতে ছুটতে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালে বিহারী। একগাল হেসে বল্লে, ভুলি যাস নাই সোদাম। কখন সখন সময় হলে ইধারকে আসিস।

মাথা নেড়ে সায় দিলে সুদাম।

গাড়ী তখন চ'লতে সুরু করেছে। এতদিন পরে পেছনের সব বন্ধন সত্যি সত্যিই কেটে গেল। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে আছড়ে পড়লো গাড়ীর জানলায়।

সেই বাতাসে প্রাণ ভ'রে নিঃশ্বাস নিলে সুদাম।

মাইলের পর মাইল জুড়ে তৈরী হচ্ছে শালজংগলের জমি। রুক্ষ পাথুরে মাটি! গাঁইতি কোদাল প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে বারবার। দরদর ক'রে ঘাম ঝরে সাঁওতাল, লোধা আর ওরাওঁ কুলিদের নিকষ কালো অংগে। দিগন্তব্যাপী বিরাট শুকনো প্রান্তরটা খাঁ খাঁ ক'রতে থাকে দুপুরের রোদে। চোখ ঝল্‌সে যায়।

তবু কাজ চলছে।

হার মানছে পাথুরে মাটি। স্তরে স্তরে সঞ্চিত কাঠিন্যের দম্ভ ছিটকে

পড়ছে গাঁইতির আঘাতে। আগুনের ফুলকি ছোটে। ঠন্ ঠন্ ক'রে শব্দ ওঠে পাথরে পাথরে। প্রতিবাদের করুণ আর্তনাদ।

হাজার কুলি ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাঁইতি কোদাল নিয়ে। বর্ষার শেষ থেকে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত চ'লবে জমি তৈরীর কাজ। এখনো কয়েক মাস বাকী।

সুদামেরও কাজ জুটে গেল।

পরের জমি, পরের কাজ। তবু কী এক পরিতৃপ্তি!

ঝাড়গ্রাম থেকে গিধনি পর্যন্ত কোনো জমি পড়ে থাকবে না। মেঘ চাই, জল চাই, শস্য চাই। তাইতো এত আয়োজন। দশ বিশ বছর পরে উদ্ধত শির তুলে উঠে দাঁড়াবে অজস্র শালগাছ। গর্বিত আহ্বানে ডেকে আনবে খণ্ড খণ্ড উড়ন্ত কালো মেঘ। আকাশ ভেঙে অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামবে রুক্ষ জমির চাতক-জিহ্বায়।

সেদিন সুদাম কোথায় থাকবে কে জানে!

কাজের ভেতর নিজেকে নিঃশেসে ডুবিয়ে দিয়েছে সুদাম। সেই সঙ্গে ডুবিয়েছে কাঁচি মদের স্রোতে। দিনে ঘাম জল করা মেহনৎ, রাত্রে সব-ভোলানো ঝাঁজালো মদের বেহুঁশ নেশা।

তার মদ খাওয়ার বহর দেখে অন্য সঙ্গীরা অবাক হয়। সুদাম হা হা ক'রে হাসে আর বলে, কুশমণ্ডলের করালী ভূমজের নামটো জানছিস নাই? উয়ার নাতি বটে আমি, হুঁ।

দেখতে দেখতে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে।

মহুয়া-মুকুলের ফুল ঝ'রে ফল দেখা দিল। ফলও পাকলো একদিন। বসন্ত বিদায় হ'ল। গ্রীষ্মের পালাও শেষ। শাল পিয়াশালের পল্লবে বেড়ে ওঠা ফলের ঝরবার কাল এলো। নামলো বর্ষা।

দিন গড়িয়ে মাস। মাসের পরে মাস কেটে চললো।

জমির পর জমির তামাটে রং ঢাকা পড়লো অজস্র শাল চারার সবুজ পাতায়। ওই নরম নরম চারাগুলোই একদিন আকাশে মাথা তুলবে!

নতুন জমিতে কাজ ক'রতে ক'রতে মাঝে মাঝে বিভোর হ'য়ে তাকিয়ে থাকে সুদাম। এলোমেলো হাওয়ায় দোল খায় সবুজ সবুজ পাতাগুলো। উদ্গত একটা দীর্ঘশ্বাস হয়তো কখনো বেরিয়ে আসতে চায় বুক থেকে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নেয়। আবার গাঁইতির কোপ পড়ে কঠিন মাটির বুকে।

সন্ধ্যে হ'লেই সব চিন্তার শেষ। আকণ্ঠ মদ খেয়ে হা হা ক'রে হাসতে

থাকে করালী সর্দারের নাতি। তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো একমাত্র কোপপাড়ার নন্দীলাল। নন্দীলালের বয়েস সুদামের চেয়ে হয়তো বেশীই হবে। চেহারা ছিপছিপে। মুখখানা কদাকার। তারই ভেতর পরিপাটির ত্রুটি নেই। একমাত্র সুদাম ছাড়া আর কাউকে সে আমল দেয়নি কখনো।

বর্ষার শেষে নন্দীলালও চ'লে গেছে এখানকার কাজ ছেড়ে। সুদামকে সাধাসাধি করেছিল। নিয়ে যেতে পারেনি। সুদাম ব'লেছিল, যতদিন শাল জংগলের কাজ হবে, ততদিনই ইখানকে থাকবো আমি। তু যাবি, যা—।

পূজোর ঠিক পরেই প্রবল জ্বরে বেশ ক'দিন প'ড়ে ছিল সুদাম। মদও খেতে পারেনি সেই সময়। কুশমণ্ডলের স্মৃতিগুলো সুযোগ পেয়ে বানের জলের মতো এসে তার মনটাকে একেবারে দিশেহারা ক'রে দিলে। নতুন ক'রে মনে পড়লো মানদার মুখখানা। মনে পড়লো মানীকে। চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগলো মৌলবনী ষ্টেশন আর রুকন ডুংরির ছবি।......এতদিনে হয়তো বাঁধের গায়ের জমি দু'খানাও চ'লে গেছে গোলোক দত্তের হাতে। পিয়ালিও হয়তো চ'লে গেছে কোনো নতুন অধিকারীর দলে। কানা বায়েন আর নতুন গান বাঁধে কিনা কে জানে!

জ্বরের তাড়নায় নির্জীবের মতো শুয়ে থেকে এ ক'দিন কত কথাই না ভেবেছে সুদাম।......যেখানে মানী নেই, জটাধর নেই, পিয়ালি নেই—তেমন এক নতুন দিন থেকে যদি পুরনো জীবনটাকে আবার গোড়া থেকে সুরু করা যেতো!

জ্বর থেকে ওঠার পর সবে সেদিন সন্ধ্যের এক ঢোঁক মদ খেয়ে বাইরে বেরুতে যাচ্ছিল সুদাম। হঠাৎ নন্দীলাল এসে হাজির।

নন্দীলাল বললে, বউটো আমার মরি গেল রে সোদাম।

সুদাম বললে, তবে তো উয়ার জ্বালা জুড়াইঁ গেল রে!

হা-হা ক'রে খানিকটা হাসলে নন্দীলাল। তার পাল্লায় প'ড়ে বউটার যে দুর্গতির শেষ ছিল না, একথা সে-ই বোধহয় সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করে।

হাসি থামিয়ে নন্দীলাল বললে, কাল আবার চলি যেছি। যাবি নাকি? দেড়া মজুরি পাই। তদের থেকা খাটুনিও কম বটে।

নিস্পৃহস্বরে সুদাম বললে, মিহনৎ ক'রতে ভুমজের জোয়ান ভয় বাসে নাই রে।

নন্দীলাল বললে, রাখ্ তর ভূমজের দিমাক। কম খা'টবো, বেশী মজুরি পাবে—উটাকে কার লোভ নাই ?

আমার নাই। সুদাম বললে।

একটু করুণার হাসি হেসে একটা বিড়ি ধরালে নন্দীলাল। বললে, থাকলে কি আর গোঁয়ার ভূমজের ঘরকে জনম লিস ?

সুদাম একটু হাসলে। সারা পরগণার মাটি যেদিন ভূমিজের ছিল, সেদিন একথা বললে নন্দীলালকে হয়তো মাথা নিয়ে ঘরে ফিরতে হত না।

আমেজে বিড়িতে একটা টান দিয়ে নন্দীলাল বললে, দুইদিন হাট, দুইটা দিনই জুয়া বসছে আমার উখানকে।

সুদামের নিস্পৃহতায় হঠাৎ ছেদ এলো। সাগ্রহে সে প্রশ্ন ক'রলে, ঠিক বুলছিস্ ?

নন্দীলাল আমিরী চালে বললে, উটা না থাকলে আমি পড়ি থাকি উখানকে ?

সুদামের কৌতূহলী চোখের দিকে তাকিয়ে নন্দীলাল এক নাগাড়ে বলে চললো তার নিজের কথা। শাল-জংগলের কাজ ছেড়ে মৌভাণ্ডারের কারখানায়। সেখান থেকে গোরাসাহেবের খাদান। দেড়া মজুরির খবর যারা জানে না তারাই পড়ে রয়েছে এখানে সেখানে। খবর পেলে সবাই ছুটবে। তার আগে গিয়ে একটা পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত ক'রে নিতে পারলে সবদিক থেকে সুবিধে।

সুদাম ইতস্ততঃ করে বললে, উ কাজে আমার মন যদি না বসে ?

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠ্লে নন্দীলাল।—তবে তর মন লিই শাল-জংগলই পাহারা দে শালা ভূমজ। ইখানকে আমার অভাব কি ছিল বল্ ? মিহনৎ করলে পয়সা। পয়সা ছড়ালে জুয়া বল্, মেয়্যামানুষ বল্—অভাব আছে গিধনি চাকুলিয়ার বাজারকে ? তবু আমি কেনে যেছি তা বল্ ?—

সুদাম চুপ করে রইলো। নন্দীলাল বিরক্ত হয়ে বললে, শাল-জংগলের কাজ যিদিনকা খতম হবে, সিদিনকা কী করবি ?

একটু ভেবে সুদাম বললে, নাঃ, চল্ তর সঙ্গেই যাবো আমি।

বেপরোয়া আনন্দে সুদামের পিঠে একটা চড় মেরে নন্দীলাল বললে, শালা আপন মাটি পর করি দিঁছিস্, তবু পরের মাটিকে তর টান কমে নাই ?

সে কথার কোনো জবাব দিলে না সুদাম। মুহূর্তে তার মনটা হঠাৎ

খুশী হ'য়ে উঠেছে। বাধা নেই, বন্ধন নেই—এই তো ভালো। পালার পর পালা বদল। এমনি করেই দিন চলে তো চলুক। মন্দ কী!

হেমন্ত দুপুরের সূর্য সবে পশ্চিমে একটু হেলেছে।

আধঘন্টা হ'ল ভাত খেয়ে আবার কাজে বেরিয়ে গেছে দুনীচাঁদ। ফিরতে সেই সন্ধ্যে।

মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে ছিল মানী।

কুঠির সামনে ঢালু জমিটায় চ'রে বেড়াচ্ছে কাদের একটা গরু। পাহাড়ের গায়ে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে ভেসে আসছে বনতিতিরের ডাক। পূবের মহুয়া জংগলের ভেতর কোথায় যেন ব'সে মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে একটা ময়ূর। তার তীক্ষ্ণ কর্কশ রবে হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে উঠছে চারিদিক।

চোখে সবে একটু তন্দ্রা নেমেছিল। দরজার কপাটে ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে শব্দ উঠতেই মানী চোখ খুলে তাকালে।

দুনীচাঁদ নয়। নিতাই গোপ এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। গায়ে একটা ঢলঢলে জামা। হাঁটু পর্যন্ত ধুলোয় ধূসর। হাতে গামছায় বাঁধা পাঁচ সাতটা কাঁকুড়।

বাপকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসলে মানী। বিতৃষ্ণার একটা অস্বস্তি মনের ভেতর পাক দিয়ে উঠলেও বাইরে তার চিহ্ন কিছু ধরা পড়লো না। গত সাত আট মাসের ভেতর মেয়েকে নিতে এসে দু'বার ফিরে গেছে নিতাই। দুনীচাঁদ আপত্তি করেনি। অনিচ্ছে দেখিয়েছে মানী নিজেই।

একগাল হেসে নিতাই বললে, ভালো আছিস বটে?

হুঁ, আছি।

মেঝের ওপর ব'সে পড়লে নিতাই। গামছা থেকে কাঁকুড়গুলো সযত্নে খুলে রাখলে। অনেক যত্ন করে এনেছে মেয়ের জন্যে। অনেক কষ্টে সামান্য কয়েকটা পয়সা বাঁচিয়ে কিনে দিয়েছে মানীর মা।

কোনো ভূমিকার অবসর না দিয়ে মানী বললে, আবার কি আমাকে লিই যাবার কথা বুলবে তমার জামাইকে?

নিতাই থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললে, কেনে, তর যাওয়ার মন নাই?

নাই। মিছাই তুমি বারবার আসা করো।

নিতাই কী বলবে বুঝতে পারলে না! বিয়ের পর মেয়েটাকে একবার চোখের দেখাও দেখেনি মানীর মা। যতদিন নিতাইয়ের কড়া নিষেধ ছিল ততদিন মন পুড়ে গেলেও সে মুখ খুলতে সাহস পায়নি। এখন আর তার চোখের জল বাধা মানে না। মেয়ে দু'বার বাপকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তাই বলে মাকে কি ফেরাতে পারবে? ক'দিন ধরে সাধ্য-সাধনা করে সে নিতাইকে রাজী করিয়ে এবার পাঠিয়েছে। বলেছে, এবারও যদি নিতাই একা ফেরে তাহ'লে বাঁধের জলে বউয়ের মরা মুখ দেখতে হবে তাকে।

কিন্তু কথা তোলার আগেই বেঁকে বসেছে মেয়ে। এই মেয়েকেই জোর করে বিয়ে দিয়েছিল নিতাই। সে জবরদস্তির মেয়াদ তো সেদিনই শেষ হয়ে গেছে।

অসহায়ভাবে নিতাই বললে, বারবার কেনে এত গোঁ রাখছিস মানী?

মানী বললে, যদি কোনোদিনকে আমার মন চায় তো নিজে যাবো।

নিরুপায়ের দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো নিতাই। মানী আর সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই। অনেক বড়ো হয়ে গেছে তার মেয়ে। চিরকালের মতো পরও হয়ে গেছে সেই সঙ্গে!

মাদুর গুটিয়ে রেখে মানী বললে, তুমি জল খাও, জিরাও বসি।

এক ঘটি জল রেখে মানী চলে গেল ভাত চাপাতে। অসহায়ের মতো বসে রইলো নিতাই। কুশমণ্ডলের অনেক নতুন খবর এনেছে সে। এক এক ক'রে খবরগুলো বলবে ভেবেছিল। কিন্তু প্রথমেই মন বিষিয়ে দিয়েছে মানী। এমন কি আগের দু'এক দফায় যাবার সময় যে দু'টো একটা টাকা চেয়ে পাওয়া গেছে, তাও হয়তো এবারে দেবে না। তবু চেয়ে দেখতে দোষ কি?

ঢক্ ঢক্ ক'রে খানিকটা জল খেয়ে গামছা মাথায় দিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়লে নিতাই।

মানী যখন ভাত বেড়ে বাপকে ডাকতে এলো তখন বেলা অনেকখানি প'ড়ে গেছে। কাছেই কোথায় একটা পাহাড়ী ঝিঁঝিঁ বন মাতিয়ে একটানা ডেকে চলেছে। সে শব্দে কানে যেন তালা লাগে।

খেতে বসে নিতাই বেশ কিছুটা খোশ মেজাজে ফিরে এলো। দু'চারটে ঘরোয়া কথার পর বললে, তর মা বারবার বুললে, তাই লিতে আ'লম তকে। না গেলে সিটা কান্দাকাটা করবে রে।

মানী কোনো জবাব দিলে না।

নিতাই আবার বললে, কানমোড়া ছাগলটো তিনখান ছানা দিছে রে। তর মা বলে, মানী নাই ঘরকে তো যতন করবে কে?

মানী একটু চঞ্চল হয়ে উঠলে। তার বিয়ের আগে ওই ছাগলটা ছিল তার সবচেয়ে আদরের। তখন সবে শিং দেখা দিয়েছে তার। দুরন্ত, চঞ্চল বাচ্চাটা চলতো লাফিয়ে লাফিয়ে। মুখের ভেতর আঙল দিলে পরম উৎসাহে চিবিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করতো। খিল্‌খিল্ করে হেসে গড়িয়ে পড়তো মানী। সেই ছোট্ট বাচ্চাটা ছানা দিয়েছে! এখন কি আর দেখতে তেমন তেল কুচকুচে আছে?

মানী উৎসুক হ'য়ে বললে, ছানাগুলা কেমন দেখতে হল?

তিনখান ছানাই ভারী সোন্দর বটে। না গেলে আর দেখবি কেমন করি বল্?

মানী আবার চুপ হয়ে গেল।

নিতাই একটুক্ষণ কী যেন ভেবে তারপর বললে, সোদাম ভূমজটো আর গিরামকে ফিরে নাই।

নিস্পৃহের মতো মানী বললে, না ফিরুক।

তার নিরাসক্ত জবাবে নিতাই কী বুঝলে তা সে-ই জানে। পরম তৃপ্তিতে এক ঢোঁক জল খেয়ে নিয়ে বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললে, ঝুমুর মেয়্যাটো শেষকে পাগল হই গেল রে মানী।

তীব্র আগ্রহে মানী সোজা হয়ে বসলে।—কবে? কেনে পাগল হল?

কেনে হল তা কে বুলবে! নাচনা গাওনা খতম হই গেইছে সব। জটা ভূমজকে থুক্ দিছে লোকে।

পাহাড়ী ঝিঁঝিঁর কর্কশ ডাক কখন যেন থেমে গেছে। সিদ্ধাই পাহাড়ের আড়ালে নেমে পড়েছে অপরাহ্নের রক্তাভ সূর্য। কেমন একটা থমথমে নীরবতা নেমে এসেছে বিষবরণীর উপত্যকায়।

নিতাই আর এক ঢোঁক জল খেয়ে বললে, হঁ, মরদ ছিল বটে করালী ভূমজ। অর বেটা বল্, নাতি বল্—কনোটাই মরদ হ'ল নাই। এতদিনকেও সিটা বুঝতে পেলি নাই?

কোনো জবাব দিলে না মানী। তার মনে তখন অনেকদিনের জমাট এক অসহিষ্ণু ঘৃণা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে সুরু করেছে। মেয়ের থমথমে মুখের

দিকে তাকিয়ে নিতাই আর কথা বাড়ালে না। মুখ ধুতে চ'লে গেল বাইরে।

সন্ধ্যের আগে ঘরে ফিরে এলো দুনীচাঁদ। শ্বশুরকে দেখেই তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। লোকটা আসে মেয়েকে নিয়ে যাবার নাম করে। মেয়ে যাবে না জেনেও আসে। ফিরেও যায় একা। যাওয়ার আগে টাকা চায়। তিনকুড়ি টাকা পণ দিয়ে মানীর মতো বউ সবাই পায় না। দুনীচাঁদের ভাগ্যে ছিল তাই পেয়েছে। কিন্তু দেনার জের মেটেনি। টাকা দিতে রাজী না হলেই একগাল হেসে নিতাই বলে, মেয়্যা জামাই বুড়াকে না দেখলে কে দেখবে তা বলো না কেনে চৌকিদার?

নিরুপায় হয়ে এক টাকা হ'ক, আট আনা হ'ক দিয়েছে। তাই পেয়েই নিতাই খুশী।

দুনীচাঁদ মনে মনে ঠিক করলে, এবারে আর এক পয়সাও দেওয়া হবে না। তাতে মানুষটা যা খুশি বলে বলুকগে।

রাত্রিতে আর একবার মেয়েকে নিয়ে যাবার কথা তুলেছিল নিতাই। মানীকে কিছু ব'লতে হল না। স্পষ্ট আপত্তি জানালে দুনীচাঁদ। নিতাইয়ের ওপর সে ভীষণভাবে ক্ষেপে গেছে।

সকাল বেলা নিতাই রওনা হ'য়ে গেল। দুনীচাঁদ সত্যি সত্যিই এবার একটা পয়সাও দেয়নি। পথে খাওয়ার জন্যে গামছায় কিছু মুড়ি বেঁধে দিতে যাচ্ছিল মানী। একটানে গামছাখানা তুলে নিলে নিতাই। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললে, ভুখ্ পায় তো মুড়ি কেনা করি খাই লিব, হুঁ।

মানী নিরুত্তরে মুড়িগুলো তুলে রাখলে। মেয়ে জামাইয়ের ওপর একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে গেল নিতাই। হা হা ক'রে হেসে দুনীচাঁদ বললে, খুব গোসা হই গেল রে তর বাপ। আর তকে লিতে আসবে নাই রে।

মানী ভালো মন্দ কিছুই বললে না।

জালি পাতার কাজ এখন ক'দিন থেকে ক্রমেই এগিয়ে আসছে ভাঁটির দিকে। রান্না ক'রতে ক'রতেই অনেক গলার শব্দ মানীর কানে ভেসে আসছিল। কুঠির নীচেই বোধহয় কাজ হচ্ছে আজ। দুনীচাঁদ হয়তো

কুঠির নীচে দাঁড়িয়ে আপন খুশি মতো হাঁকডাক করছে।

জানলার ধারে এসে দাঁড়ালে মানী।

সকালের রোদ লুটিয়ে পড়েছে চারিদিকে। আলো ঝলমল সিদ্ধাই পাহাড়ের মাথায় মাথায় শাল-মহুয়ার পাতাগুলো চক্চক্ করছে। নীচে বিষবরণীর জলে দাঁড়িয়ে রোদে পিঠ দিয়ে মুখ গুজে কাজ করছে দশ-বারো জন কুলি কামিন। আশে পাশে তুনীচাঁদ কোথাও নেই। কৌতূহলী চোখ দু'টো ঘুরে এলো এপাশে ওপাশে যতদূর নজর চলে। দূরে কারখানা বাড়ীর সরু চিমনি দিয়ে কালো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে আকাশে। চারিদিকের এই পাহাড় আর পাথরের রাজ্যে ওই চিমনিটা মানীর খুব ভালো লাগে। তুনীচাঁদ একদিন তাকে কারখানার ভেতরটা দেখিয়েও এনেছিল। সেদিন তার কী দাপট! সে কথাগুলো মনে পড়তেই আপনমনে একটু হাসলে মানী। লোকটা নিজের দাপটে নিজেই দিশেহারা।

মানীর হাসিটুকু অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেল। এক অসহ্য বিস্ময়ে, এক প্রচণ্ড বেদনার আকস্মিক ধাক্কায় সে যেন বোবা হ'য়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে তার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে পিষে যেন অসাড় হ'য়ে গেল।

বারবার ক'রে তাকালে মানী। ঝুঁকে পড়লে জানলার গরাদের ওপর। না, কোনো ভুল নেই। সেই মুখ, সেই চোখ—সেই কালো পাথরের দেহ।

কোমর টন্‌টন্ করে ওঠায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুদাম। বহুদিন ধ'রে গাঁইতি কোদাল নিয়ে কাজ করবার পর এখানকার কাজে এখনো সে পাকা হয়ে উঠতে পারেনি। কোমরে টান ধরলেই সোজা হ'য়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নেয়।

বোবা দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে ছিল মানী। হঠাৎ ভয়ে আঁৎকে উঠে অস্ফুট চিৎকার করে সে ছুটে গেল ঘরের ভেতর। দ্রুত হাতে এক ঘটি জল নিয়ে আবার এলো জানলায়। অস্ফুটকণ্ঠে একবার সুদামের নাম ধ'রে ডাকলে। সে ডাক হয়তো সুদাম শুনতে পায়নি। সে তখনো আঁজলা ক'রে বিষবরণীর জল খাচ্ছে।

টলমল ক'রে উঠলো মানীর চোখ। কে না জানে বিষবরণীর জল বিষ? তিয়াস লেগেছে ব'লে কি মধুর বদলে বিষ খেতে হবে?

মানী গলা চড়িয়ে আর একবার ডাক দিলে। তারপরই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কুঠির পেছন দিয়ে সরু একটা রাস্তা নেমে এসেছে বিষবরণীর কোলে। ঘটি হাতে তর্‌তর্‌ ক'রে নামতে লাগলো সেই পথে।

সুদাম তখনো মুখ নীচু ক'রে জল খেয়ে চ'লেছে। পাশেই ছিল নন্দীলাল। তার নজর পড়েছে আগে। সুদামের পাঁজরে একটা গুঁতো দিয়ে সে বললে, উধারকে আখ্‌ রে—

চোখ তুলে তাকালে সুদাম। নন্দীলাল বললে, ওই শালা চৌকিদারের বউটো। চেহারাটা আখ্‌ একবার—

চোখের পলক থেমে গেল সুদামের। সকালের আলোও যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল তার চোখের সামনে। চৌকিদারের বউ! নিতাই গোপের মেয়ে! সুদামের জীবনে সবচেয়ে বড়ো বেইমান, সবচেয়ে বড়ো দুশমন সেই মেয়েটা!

ছুটতে ছুটতে নেমে আসছে মানী। ভরা ঘটির জল ছলকে প'ড়লো দু'বার। ব্যাকুলতা তার চোখে মুখে—সর্বাংগে।

একেবারে মুখোমুখী এসে দাঁড়ালে মানী।

কারও মুখে কোন কথা নেই। নির্বাক নিথর দু'টি পাথরের মূর্তি। আশে পাশে যে এতগুলো মানুষ তাও যেন ভুলে গেছে তারা।

ঘটিটা সুদামের দিকে এগিয়ে দিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে মানী বললে, ই জল খা সোদাম। উ জল আর খাস্‌ নাই; উ জলে বড়ো বিষ রে।

সুদাম কোনো কথা বললে না। আচমকা টানে ঘটিটা টেনে নিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। একখানা বড়ো পাথরে ধাক্কা খেয়ে ঘটিটা ছিটকে পড়লো বালির ওপর।

কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত।

নেকড়ের মতো হিংস্র জলন্ত দৃষ্টিতে মানীর দিকে একবার তাকিয়ে সুদাম উঠে পড়লে জল থেকে। কয়েক লহমার মধ্যে সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল ওপাশের তামাটে ঢিবির আড়ালে। কালবৈশাখীর মতো ঝড়ের বাতাস শোঁ শোঁ ক'রে উড়ে এসেছে তার মনে। আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেও যদি সে ঝড় সুরু হ'য়ে যায়!

বিহ্বলের মতো কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো মানী। অতগুলো লোকের অবাক দৃষ্টির কথাও মনে নেই তার।

নন্দীলাল ঘটিটা তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল। এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়েছে মানী। নন্দীলালের হাত থেকে টোল খাওয়া ঘটিটা নিয়ে অবশ পা দু'খানা টানতে টানতে উঠে গেল সরু রাস্তাটা দিয়ে।

নন্দীলাল নিজের মনেই হাসলে একটু। তারপর চেঁচিয়ে বল্‌লে, হাঁ করি সব কী দেখছো বটে? কাম করো, হাত চালাও—।

অতগুলো মানুষের সামনে স্পষ্ট দিনের আলোয় যে আকস্মিক ঘটনাটি ঘ'টে গেল, তার খবর একটু পরেই পৌঁছে গেল দুনীচাঁদের কানে। বাঁকের ওপাশে উজানে কাজের তদারকি ক'রছিল সে। কিছু বুঝতে না পেরে সে হন্‌হন্ ক'রে রওনা দিলে কুঠির দিকে।

মানীর অবসাদ তখনো কাটেনি। হাত পা কাঁপছে। চোখের সামনে সব কিছু যেন কাঁপছে সেই সঙ্গে। আজ এতদিন পরে যদি দেখা হ'ল তবে এ নির্মম মুহূর্তে কেন হ'ল? দোয়ারসিনীর কাছে চোখের জলে মানত ক'রে আর এইটুকুই কি তার কপালে বাকী ছিল?

খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই মানীর বুকের রক্তও যেন শুকিয়ে গেল। হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে আসছে দুনীচাঁদ।

দুম্‌দাম্ ক'রে পা ফেলে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালে দুনীচাঁদ! মানীর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে থেমে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই তীব্র স্বরে হুংকার দিয়ে উঠলে।—কাকে জল খিয়াতে গেইছিলি?

বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকালে মানী। নির্ভয়, অনাড়ষ্ট চাউনি। একটুও দ্বিধা না ক'রে বললে, কুশমণ্ডলের মানুষ।

নাম কী? চীৎকার ক'রে উঠ্‌লে দুনীচাঁদ।

সোদাম সদ্দার।—জবাব দিলে মানী।

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দুনীচাঁদের মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠলো। নিতাই গোপের মুখে শুনে শুনে নামটা তার বহু পরিচিত হ'য়ে গেছে। মানীর কথা শেষ হ'তে না হতেই তীব্র কর্কশ স্বরে প্রশ্ন ক'রলে, এতগুলা মানুষ থাকতে উয়াকেই তর জল খিয়াবার গরজ কেনে, বল্—

কথাটা বলতে বলতেই কেমন উন্মাদের মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়লে মানীর ওপর। তার চুলের মুঠি ধ'রে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মরিয়ার মতো বলতে লাগলো, জবাব দে। বল্, তর কেনে এত গরজ? বল্—

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রেও দুনীচাঁদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে

নিতে পারলে না মানী। হু হু ক'রে চোখের জল নেমে এলো তার গাল বেয়ে। অসহায় আর্তনাদ ভেঙে পড়লো তার কান্নার ঢেউয়ে ঢেউয়ে। তারপর সহসা চীৎকার ক'রে উঠে সে লুটিয়ে পড়লে মাটিতে।

জল খিয়াবো আমি। যত খুশি জল খিয়াবো। মারতে মন চায় মার। কাটতে মন চায়, কাট—।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মানী। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলে তুনীচাঁদ। চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইলো মানীর দিকে। সত্যিকারের মরদ যে হয়, সে কি এমন সময়ে হাত তুলতে পারে কোনো মেয়ের গায়ে? দেবতার কোপে সে হাত যে খ'সে পড়বে!

নির্জীবের মতো মানীর পাশে ব'সে পড়লে তুনীচাঁদ। করুণ অসহায় দৃষ্টিতে মানীর কান্নাভাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে অবসন্ন স্বরে বললে, তর যা খুশি তাই করিস—।

মানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চ'লেছে। কোনো কথারই জবাব সে আর দিলে না। তুনীচাঁদ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কান্নার বেগ দ্বিগুণ হ'য়ে নেমে এলো মানীর চোখে। সে স্পষ্ট বুঝেছে, মনের আগুন তার নেভেনি। এতদিন পরে ছাইচাপা সে আগুন আবার দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছে আজ।

ব্যাপারটা চোখের সামনে ঘ'টে যাওয়ার পর নন্দীলাল সারাদিন কাজ ক'রেছে বটে, কিন্তু মন লাগাতে পারেনি এতটুকু। সুদামকে ঘিরে তার বিস্ময় যেমন বেড়ে চ'লছিল, তেমনি হচ্ছিল অনুকম্পা। গোঁয়ার বোকা না হ'লে কোন্ মরদ অমন রূপসী মেয়ের দেওয়া জল ছুঁড়ে ফেলতে পারে?

সূর্য ডুবে গেল। সেদিনকার মতো কাজ শেষ। দলের সঙ্গে নন্দীলালও চ'ললে কারখানা বাড়ীর দিকে। সেখান থেকে মজুরী বুঝে নিয়ে যে যার ঘরের পথ ধ'রবে।

নন্দীলাল মজুরী নিয়ে বেরিয়ে এলো। তার মন প'ড়ে রয়েছে সুদামের কাছে। বেশ একটা মজাদার কাহিনী শোনবার আশায় তার মন চঞ্চল। অনেক কিছু নিজেই সে কল্পনা ক'রে নিয়েছে। সুদাম কিছু বলুক আর নাই

বলুক, আসল ব্যাপার বুঝতে কিছু বাকী নেই তার।

বেশ জোর পায়ে হাঁটছিল নন্দীলাল। হঠাৎ ঢালু রাস্তার পাশে একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দুনীচাঁদ। নন্দীলাল একটু ঘাবড়ে গেল। বোকার মতো একটু হেসে বললে, ঘরকে চ'ললে নাকি গো?

গম্ভীর মুখে দুনীচাঁদ বললে, হঁ, ঘরকে যেছি।

নন্দীলাল একটা বিড়ি এগিয়ে দিলে। নীরবে বিড়ি টানতে টানতে নন্দীলালের সঙ্গে হাঁটতে লাগলো দুনীচাঁদ। কয়েক পা এসে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়লে। নন্দীলালও থেমে গেল ভয়ে ভয়ে।

দুনীচাঁদ বললে, তর আপন ঘর কুথাকে?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল নন্দীলাল। আমৃতা আমৃতা ক'রে বললে, আমার ঘর বটে কোপপাড়া। ধলভূমগড় ছাড়লে তবে কোপপাড়ার টিশন আসে।

সোদাম কুলিটো তর কে হয়?

আমার কেউ হয় নাই। গিধনিকে শালজংগলের কামে ছিলম। তখন চিনলম উয়াকে।

ইখানকে বাবুরা আর কাম দিবে নাই। উয়াকে চলি যা'তে বুলবি।

নন্দীলাল চালাক মানুষ। একগাল হেসে বললে, হঁ, তা কাম না দিলে নিচ্চয় চলি যাবে বটে।

দুনীচাঁদ তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে নন্দীলালের দিকে। তারপর কর্কশ কণ্ঠে বললে, কথাটো উয়াকে জানা করাই দিবি।

দিব। ঘাড় নেড়ে বললে নন্দীলাল।

দুনীচাঁদ আর দাঁড়ালে না। বাঁদিকে একটা সরু পায়ে-চলা পথ ধ'রে চ'লে গেল কুঠির দিকে। দেখতে দেখতে কনক ধুতুরোর ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আপনমনে একটু হেসে নন্দীলাল নিজের পথ ধ'রলে।

কারখানা-বাড়ীটা থেকে অন্তত আধমাইল পথ হাঁটলে তবে নন্দীলালের আস্তানা। হাটতলার কাছ ঘেঁষে বহু পুরনো দু'তিনটে খালি ঘর প'ড়ে ছিল অনেকদিন থেকে। নন্দীলাল দখল ক'রেছিল তারই একটা। সুদামকেও সেখানেই এনে তুলেছে।

নন্দীলাল যখন পৌঁছলো তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। দেখতে দেখতে অন্ধকার জমাট বেঁধে গেছে সিদ্ধাই পাহাড়ের বুকের ওপর।

ঘরের সামনেই কোমর সমান উঁচু একটা পাথরের ঢিবি। তার ওপর চুপ ক'রে ব'সে আছে সুদাম। মহুল মদের গন্ধে ভুরভুর ক'রছে বাতাস।

নন্দীলাল ঘরে ঢুকে আগে রান্না চাপিয়ে দিলে। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। দু'টো একটা আজে বাজে কথা ব'লে চুপ ক'রে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর সুরু ক'রলে আসল কথাটা।

কুঠির চৌকিদার তর নামে খুব গরম হই গেল রে সোদাম। বুলছে, ইথানকে তর আর কাম করা চ'লবে নাই।

সুদাম এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। নন্দীলালের কথাটা শেষ হ'তে না হ'তেই কর্কশস্বরে সে বললে, উয়ার বাপের কারবার ইটা? করালী সর্দ্দারের নাতি বটি। উসব শিয়াল-মরদকে ডর বাসি নাই আমি।

কথাগুলো সব জড়িয়ে জড়িয়ে গেল। নন্দীলাল বুঝলে, আজ আর মাত্রা রেখে মদ খায়নি সুদাম। বুঝতে আরও সুবিধে হ'ল করালী সর্দারের উল্লেখে। গলায় মদ পড়লে ও লোকটার নাম অন্তত একবার সে ক'রবেই।

নন্দীলাল উৎসাহ পেয়ে গেল। বললে, তকে বলিহারি সোদাম। অমন সোন্দর মেয়্যার হাতের জলটো তু রেয়াৎ করলি নাই রে!

সুদাম বললে, উয়ার টুঁটি ছিঁড়ি নাই কেনে তাই বল্ নন্দা।

নন্দীলাল আর একটু এগিয়ে বসে বললে, সাঙা করবি উয়াকে?

সাঙা! বিড়বিড় ক'রে উচ্চারণ ক'রলে সুদাম।

আসমান-জমির তফাৎ। স্বামীর ঘর ছেড়ে মনের মানুষের ঘর ক'রতে যে মেয়ে ব্যাকুল, সে-ই পারে ছুটে আসতে। সাঙা বসে সেই মেয়ে। মানী সে মেয়ে নয়। ডাকিনীর মতো সুদামকে ভুলিয়ে রেখে সে কুল বাঁচাতে ছুটেছিল। লোক দেখানো ইজ্জতের ভয়ে যে মেয়ে সুদামকে বিয়ে ক'রতে পারেনি, সে আজ আসবে সাঙা বস্‌তে?

সুদামকে নীরব দেখে নন্দীলাল বললে, তর গিরামের মেয়্যা?

হুঁ। গোপের ঘরকে জনম উয়ার।

সিন্দুর-ঘষা করিস নাই কেনে?

সুদাম চুপ ক'রে রইলো। এর জবাব দিতে গেলে অনেক কথা আসে। এ কথার বাতাসে বুকের আগুন আরও দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে ওঠে।

দাঁতে দাঁত পিষে সুদাম বললে, আর দেখা হবে জানতম নাই রে! তা যদি হ'ল তো শেষ বুঝাপড়া ই খাদানের মাটিকে বসি করি যাবো আমি।

নন্দীলাল বললো, শালা চেকিদার বুঝুক—ইবার কার চাকরি থাকে, কার চাকরি যায়।

কথাটা ব'লে আপন রসিকতায় সে নিজেই হা হা ক'রে হেসে উঠলে।

এক এক ক'রে কয়েকটা দিন গড়িয়ে গেল।

সুদামকে কাজে নামাতে বাবুরা আপত্তি করেনি। সেই থেকে ত্নীচাঁদকে দেখলেই মুচকি হাসে নন্দীলাল। মন নিয়ে কারবার সে কোনোদিন করেনি। নারীকে সে চিরকাল মেয়েছেলে ব'লেই জেনে এসেছে। মোরগ লড়াইয়ের মধ্যে যে উৎকট আনন্দের নেশা আছে, সেই নেশা যেন এখানেও। মানীকে নিয়ে ত্নীচাঁদ আর সুদামের এই সম্পর্কটা তাকে বেশ মাতিয়ে তুলেছে।

সুদাম যেখানে কাজ করে, সে জায়গাটা এড়িয়ে চলে ত্নীচাঁদ। নন্দীলাল সুদামের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, শালা মদ গিল্‌লে তর করালী সদ্দারকে মন পড়ে! মেয়্যাটো ছিনাই লিই যা না চলি গিধরিকে। তবে বুঝি ছাতির জোর।

তীব্র তাচ্ছিল্যে সুদাম বলে, অমন মেয়্যাকে দরকার নাই আমার।

একগাল হেসে নন্দীলাল বললে, বাবা গো, মান হইছে বটে তর্!

চুপ করি যা। ধমক লাগায় সুদাম।

সেদিন হাটবার।

হাট ব'সেছে ত্'পুরে। নন্দীলাল কাজ ক'রবে কি, বার বার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। গত হাটে ত্'টাকার ওপর হার হ'য়েছে জুয়ায়। এ হাটে টাকাটা তুলতেই হবে। সুদামের গেছে আরও বেশী। এ হাটে যদিও সে টাকা উশুলের আশা তার নেই তবু ছকে একবার বসতেই হবে।

ত্'জনে যখন হাটে পৌঁছলো তখন ত্'টো চারটে দোকানে মশাল জ্ব'লে গেছে। ত্'টো জুয়ার ছক প'ড়েছে। ত্'টোতেই ভীড়ে ঠাসাঠাসি।

ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল নন্দীলাল। পাশে পাশে সুদাম। নন্দীলাল আবার একটু মুচকি হাসলে। চোখাচোখি হ'য়েছে ত্নীচাঁদের সঙ্গে। ত্নীচাঁদ বুঁদ হ'য়ে গেছে জুয়ায়। বাজীর পর বাজী ধ'রে যাচ্ছে।

নন্দীলালও খেলতে সুরু ক'রলে।

সুদামকে দুনীচাঁদ দেখতে পায়নি। কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে ভীড়ের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো সুদাম। একবার পেছন ফিরে তাকিয়েই হন্‌হন্‌ করে পা চালিয়ে দিলে। কারখানা বাড়ীকে পেছনে রেখে তর্‌তর্‌ ক'রে নেমে এলো বিষবরণীর পাশে। বালি আর পাথরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললো কুঠির দিকে।

অন্ধকার তখন সবে কালো ডানা মেলে নামতে সুরু করেছে। দু'তিন ঝাঁক পাহাড়ী পাখী ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল বিষবরণীর ওপর দিয়ে।

সেই জায়গাটায় এসে কয়েকমুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালে সুদাম। একটু দূরেই সেই পাথরখানা—যার ওপর সেদিন সে ঘটি ছুঁড়ে ফেলেছিল। সামনে পাড়ের গা বেয়ে সরু রাস্তাটা উঠে গেছে কুঠির দিকে।

বড়ো বড়ো পা ফেলে দেখতে দেখতে সে উঠে এলো কুঠির একেবারে সামনে।

মানী কী যেন একটা নেবার জন্যে ঘরের বাইরে এসেছিল। নিমেষের মধ্যে তার মুখখানা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে সুদাম। বাঘের মতো জ্বলন্ত দৃষ্টি।

সুদাম এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে গেল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলে মানী।

দাঁতে দাঁত পিষে সুদাম বললে, ভয় পেছিস্‌?

কাঁপা গলায় মানী বললে, নাই।

সুদাম কঠিন কণ্ঠে বলতে লাগলো, আপন জাত বাঁচালি, ইজ্জৎ বাঁচালি, সব তো বাঁচালি মানী। সবই যদি করবি তবে আমাকে বাওরা করি তর কোন সাধটো মিটলো রে? কেনে আমার বিশ্বাসে তু বিষের ছুবল দিলি?

থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো মানীর ওষ্ঠ দু'টি। যা সে বলতে চেয়েছিল তা আর বলা হ'ল না।

সুদাম বলতে লাগলো, তর লেগা জমিন ছাড়্‌লম, ভিটা ছাড়্‌লম,—তার এই দাম দিলি মানী?

উদ্‌গত কান্নার বেগটুকু মানী এতক্ষণ সামলে রেখেছিল। আর পারলে না। ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল নামলো তার দু'চোখ বেয়ে। ধরা গলায় বললে, কেনে ছাড়লি তু? বেশ তো ছিলি ঝুমুর মেয়্যার সঙ্গে, তাকেও কেনে

কপাল পুড়ালি ?

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলো সুদাম। পিয়ালির খবর মানীর কাছেও পৌঁছেছে!

এতদিনের জমানো নিষ্ফল অভিমান আর বিক্ষোভের বেদনা সহসা বন্যার জলের মতো হু হু ক'রে বেরিয়ে এলো মানীর বুক থেকে। সুদাম কিছু বলবার আগেই সে আবার বলতে লাগলো, বাপ আমাকে জবরদস্তির বিয়া করালো—তু লিই যা'তে পারলি নাই? বুকে পাথর বাঁধি ই মরদের ঘর করতে লাগ্‌লম, তাখন কুথাকে ছিলি? ঝুমুর মেয়্যা যদি তর সব হ'ল তবে আমার কী দাম? চলি যা সোদাম, খাদান ছাড়ি তু চলি যা।—

খদি যাই তকে লিই যাবো।

তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠলে মানী। তার কথাগুলো শোনালে এক মর্মান্তিক আর্তনাদের মতো।

কেনে যাবো আমি? তর ঝুমুরনী তর লেগা পাগল হইঁ গেল জানিস নাই? তার কাছকে ফিরি যা সোদাম, সিটাই মানা'বে তকে।

থাম্! কর্কশ চীৎকার করে উঠলে সুদাম। স্তব্ধ পাহাড়ী প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে দূরে মিলিয়ে গেল সে শব্দটুকু।

খপ্‌ ক'রে মানীর একখানা হাত ধ'রে সুদাম বললে, তকে লিই যাবো। সাঙা করি আবার ঘর বাঁধবো আমি।

মানী হাত ছাড়িয়ে নেবার কোনো চেষ্টা করলে না। করুণ অনুনয়ে ধরা গলায় বললে, চৌকিদারেয় ঘর ভাঙিস্‌ নাই রে, বড়ো দুখ্‌ পাবে।—তর পায়ে পড়ি, খাদান ছাড়ি চলি যা সোদাম।

সুদামের সমস্ত শক্তিটুকু মানী যেন নিঃশেষে হরণ ক'রে নিয়েছে। নিস্তেজ হাতের মুঠো থেকে মানীর হাতখানা ছেড়ে দিয়ে কী এক মর্মভেদী দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্তের জন্যে মেয়েটার ডাগর ডাগর চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে সে হঠাৎ পেছন ফিরে রওনা দিলে।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ডেরায় ফিরে এলো সুদাম।

নন্দীলাল ফিরে এসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকভাবে কথা পেড়েও সুদামের কাছ থেকে কোনো কথা বার ক'রতে পারেনি। বিরক্ত হ'য়ে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, শিয়াল মার্কা চৌকিদারকে একটা চোপ বসাইঁ দিলেই তো হাংগাম চুকি যায়।

আবার রাঙারোদ ছড়িয়ে সূর্য উঠলো পরদিন সকালে। কুলিকামিনেরা রোজকার মতো আবার কাজে নামলে বিষবরণীর জলে। কোথাও কোনো অশান্তি নেই। অশান্তি শুধু সুদামের বুকে। অশান্তির চেয়েও বেশী। প্রতিহিংসার লকলকে আগুন জ্ব'লে উঠেছে তার মনে। ভুনীচাঁদের সুখের ঘর ভাঙতে দেবে না মানী। সে সুখশান্তির পুরো দামটুকুও মিটিয়ে দিতে হবে সুদামকে। মৌলবনী স্টেশনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে একদিন সুদামের অমংগল আশংকায় মানী যে হাত দিয়ে সুদামের মুখ চেপে টুসুর ছড়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিল, সেই হাতই সে পেতেছে সুদামের সামনে। সুদাম যেন ভুনীচাঁদের সাজানো ঘর না ভাঙে!

আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল।

নন্দীলালও আজকাল সুদামের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়। সুদাম সারাদিন কাজ করে। সন্ধ্যের পর এক পেট মদ গিলে ঝিম্ মেরে ব'সে থাকে। জুয়া খেলতেও যায় না আজকাল।

নন্দীলাল একদিন বললে, তু গিধনিকে ফিরি যা সোদাম।

সুদাম লাল চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললে, কেনে?

ভয় পেয়ে গেল নন্দীলাল। বললে, জমিনের কাম তর পছন্দ ছিল তাই বুল্লম।

ই কামটো অপছন্দ হয় নাই। ইখানকেই থাকবো আমি।

নন্দীলাল চুপ ক'রে গেল। মদের ঝাঁজ মাথায় আর একটু চড়লেই তো কুশমণ্ডলের করালী সর্দার এসে ভর্ করবে। তার চেয়ে চুপ ক'রে থাকাই ভালো।

দু'তিন দিন পরের কথা।

বিকেলে কাজ শেষ ক'রে নন্দীলাল চ'লে গেল হাটের ভেতর। সুদাম এগিয়ে চললে ডেরার দিকে। একটু দূর থেকেই তার মনে হ'ল যেন বিহারী দাঁড়িয়ে আছে। একটু বিস্মিত হ'য়ে আর একটু জোরে হাঁটতে লাগলো সুদাম। তার চিনতে ভুল হয়নি। দূর থেকে সুদামকে দেখেই গলা চড়িয়ে এক হাঁক দিলে বিহারী। কাছে যাওয়া পর্যন্ত দেরীও সইলো না তার। একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে এসে একেবারে গ'লে পড়লে।

কেমন আছিস্, সোদাম? ভালো আছিস্ তো?

আছি বটে। সংক্ষেপে জবাব দিলে সুদাম।

সুদামকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে বিহারী অনর্গল তার নিজের কথা ব'লে যেতে লাগলো। ভরতলালের দোকান থেকে তার চাকরি গেছে। ভরতলাল লোকটা বাইরেই মুখমিষ্টি, ভেতরে একটা আস্ত শয়তান। নইলে বিহারী এত মন দিয়ে খেটেও কিনা চাকরী থেকে বরখাস্ত হ'যে গেল?

সুদাম বললে, তা চাকরীটা তর গেল কেনে? ট্যাকা পযসা কিছু সাফাই কবছিলি?

একগাল হেসে বিহারী বললে, তা কি আর করলম নাই? পণ্ডিত শালা কাজ কামটো ভাল করি শিখাপড়া করালো, কিন্তুক হিসাব কিতাবটো শিখালো নাই বে। দু'টা চারটা পযসা মারলম কি শালা ধরি ফেলে।

সুদাম হেসে ফেললে। ক্ষুব্ধ হ'যে বিহারী বললে, হাসিস কেনে? উটা কি চুরি হ'ল নাকি?

বিহারীর সঙ্গে কথা ব'লতে ব'লতে এগিযে আসছিল সুদাম। ঘরের সামনে নজর পড়তে সে একেবারে হতবাক্ হ'যে গেল। মাতামদাস ব'সে আছে। পাশে একটা ছোট বোঁচকা। সুদাম বিস্মিত হ'যে বললে, বাযেন, তুমি!

তার গলার সাড়া পেযে একটু হাসি ফুটে উঠলো মাতামদাসের মুখে। বললে, অনেক চেষ্টায তমাব খোঁজ পা'লম কারিগব। অনেক কথা আছে তমার সঙ্গে।

বিহারী এগিযে এসে বললে, বায়েনকে তর বাপ তাড়াই দিছে রে সোদাম। উয়াকে তাই আমি লিই আ'লম।

সুদাম অবাক্ হ'যে বললে, তাডাই দিল কেনে? ভিন্ বাযেন আনা করালো?

ম্লান হাসি হেসে মাতামদাস বললে, বাযেনের দরকার আর নাই গো কারিগর! ঝুমুর দল উঠি গেল।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড খুশি নিয়ে মাতামদাসের পাশের বসে পড়লে সুদাম। বললে, পিয়ালি কি জমিন চ'যবে ইবার? নাকি ভিখ্ মাগতে বেরালো আমার বাপ?

মাতামদাস আবার একটু হাসলে। সে কিছু বলবার আগেই বিহারী

বল্‌লে, নাচনী পাগল হই গেইছে রে সোদাম! হায়, হায়, অমন ভালো ঝুমুরণীটা!

চম্‌কে উঠলে সুদাম। পিয়ালির কথা মানীর মুখে সেদিন শুনেছে। বিহারীর মুখেও সেই কথা! কিছু বুঝতে না পেরে সে মাতামদাসের উদ্দেশ্যে বললে, কী হ'ল গো বায়েন? আমি তো কিছু বুঝতে পেছি নাই!

মাতামদাস একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, কপাল গো কারিগর, কপাল! মেয়্যাটো আখন নাচেও না, গায়ও না। খালি হাসে আর কাঁদে। আর ভালো হওয়ার আশ নাই!

পিয়ালির পরিণতির কাহিনী বলতে সুরু করলে মাতামদাস।

......কেন যে হঠাৎ টাকার বদলে জমি আর ভিটেমাটির ওপর পিয়ালির নজর পড়েছিল তা সে-ই জানতো। শর্তটা বড়ো অভিনব। ভিটেমাটি জমি জিরেত সব সে নিজের নামে লিখিয়ে নিতে চেয়েছিল। জটাধর যদি রাজী হয় তাহলে আমরণ পিয়ালি তার বাঁধা ঝুমুরণী হ'য়ে থাকবে—এই ছিল তার শর্ত। জটাধর রাজী হ'ল। কিন্তু জটাধরের মনের কথাটা পিয়ালি ধরতে পারেনি। সুদাম যেদিন কুশমণ্ডল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সেদিন সকালের গাড়ীতে ঘাটশিলায় চলে গিয়েছিল পিয়ালি। জটাধর তো আগের দিন থেকেই সেখানে ছিল। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু ক'রে কয়েকটা দিন কেটে গেল। হাতে বেশ কিছু কাঁচা টাকা। খরচের কোনো অসুবিধে নেই। নতুন শাড়ীও একখানা কিনে দিলে জটাধর। গহনাও কেনা হ'ল সেই সঙ্গে। মদ তো আছেই।

প্রায় মাসখানেক ধ'রে এখানে ওখানে ঘুরেছে জটাধর। পিয়ালিকে নতুন কোন্ ভাঁওতায় ভুলিয়ে রেখেছিল তা কেউ জানে না। তারপর একদিন মদে বেহুঁশ পিয়ালিকে কী একটা যেন সে খাইয়ে দেয়। তারই দু'একদিন বাদে দু'জনে ফিরে এলো কুশমণ্ডলে। জমি জিরেত যেমন ছিল তেমনই র'য়ে গেল।

একদিন যায়, দু'দিন যায়। পিয়ালি যখন তখন অকারণে হাসে। অকারণে উলটো-পালটা কথা বলে। তারপর কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই মেয়েটা একেবারে উন্মাদ পাগল হ'য়ে গেল। মাঝে মাঝে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কখনো কখনো চীৎকার ক'রে ওঠে, দোহাই তমার অধিকারী, উ অষুধ আমি খাবো নাই। হাত থেকা ফেলি দাও গো। তমার পায়ে পড়ি

আটা ফেলি দাও।—

পিয়ালির এই কথাগুলো থেকে গাঁয়ের লোকের মনে সন্দেহ জাগে। তারপর জটাধরকে ভালো রকমে ভয় দেখাতে সে সবই স্বীকার ক'রেছে। পিয়ালিকে সে গুণ্ ক'রে বশ ক'রতে চেয়েছিল। নগদ দশ টাকা দিয়ে চাকুলিয়ার কোন্ এক রোজার কাছ থেকে একটা শিকড় এনে পিয়ালিকে খাওয়ায়। মেয়েটা পাগল হ'য়ে যাবে জানলে এ কাজ সে কি করতো?

গাঁয়ের লোক জটাধরকে ছাড়েনি। করালী সর্দারের ছেলে ব'লে মান্য করেনি। পিয়ালি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তার খোরপোষ দিয়ে যেতে হবে এই শর্ত মেনে নিতে হয়েছে জটাধরকে। হাত জোড় ক'রে কথা দিতে হয়েছে গাঁওলা-পঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে।

বলতে বলতে বিভোর হয়ে গিয়েছিল মাতামদাস। এতক্ষণ পরে একবার থামলে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, নাচনীর মনের কথা কেউ আগে জানে নাই কারিগর। তমার জমিন, তমার ভিটা, সব সে তুলি দিত তমার হাতে। পাগলী মেয়্যাটো মাঝে মধ্যে কাঁদে আর বলে, কারিগরের সাধের মাটি তুমি বেচা করো নাই গো অধিকারী! আমার নামে কবালা করি দাও, তার জমিন তাকেই আমি ফিরাই দিব।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ ক'রলে মাতামদাস।

সবাই নীরব। চারপাশ থমথম করতে লাগলো।

হাটের ক্ষীণ কোলাহল ভেসে আসছে বাতাসে। মশালের আলোর আভায় হাটতলার অন্ধকারকে কেমন যেন বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল।

মাতামদাস থেমে থেমে বললে, কারিগর, আজ এত ক'টি সাল পিয়ালির বায়েন হই কাটালম, কিন্তুক এমন কপালের ফের হবে তাতো ভাবি নাই গো!

বিহারী বললে, মেয়্যাটো আমার থেকাও বোকা!

মাতামদাস ম্লান হেসে বললে, বোকা না হ'লে কি আর ঝুমুর মেয়্যা হয় কারিগর? উয়ার বড়ো দুখ্ ছিল গো, সি সব কথা তমরা জানো নাই!

সুদাম কিছুই বললে না। অনেক পুরনো কথা এসে ভীড় করেছে তার মনে। মৌলবনী স্টেশনে সেই প্রথম দেখার দিন থেকে চ'লে আসার আগের রাত পর্যন্ত।

বিহারী এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। পিয়ালির শেষ পরিণতির কাহিনী সে আগেও শুনেছে। তবু নতুন শ্রোতার মতো সে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল। সুদামের দিকে তাকিয়ে সে বললে, তর বাপ একটা শয়তান জানোয়ার। অমন ভালো ঝুমুর মেয়্যার নাচ গান সব কিনা খতম করি দিল!

সুদাম বললে, মরি গেলেও তো বন্ধ হত?

বিহারী চ'টে গিয়ে বললে, তর কি? সি পর্‌থম দিন থেকা ঝুমুরণীকে তু দেখতে লার্‌ছিস্‌।

সুদাম বাদ-প্রতিবাদ না ক'রে ঘরে ঢুকে গেল। পিয়ালির এই মর্মান্তিক পরিণতির কাহিনী সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

ক'দিন ধ'রে কারখানার বাবুদের কাছে ঘন ঘন যাতায়াত ক'রছিল তুনীচাঁদ। বাবুরা যতদিন তার কথাটায় সায় না দেন, ততদিন তার স্বস্তি নেই। কুলিকামিনের দলে সব ক'টা লোকই যা'হক চলনসই। একমাত্র বেয়াড়া মানুষ সুদাম। তাকে রাখা নিরাপদ নয়।

প্রথম কয়েকদিন তুনীচাঁদের কথায় কেউ কান দেয়নি। নামে নামে সব কুলি কামিনদের কে চেনে অত? অতগুলো মানুষের মধ্যে একটা লোক যদি কখনো কোনো অসুবিধে ঘটায়, তাকে তো এক কথাতেই বরখাস্ত করে দেওয়া যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুনীচাঁদেরই জিৎ হ'ল। সে একে সাহেবের পেয়ারের লোক, তায় কুলি কামিনের তদারক সে-ই করে। সত্যিই যদি কোনো অশান্তি ঘটে তখন দায়িত্ব নেবে কে?

সেদিন হাটবার।

দিনের শেষে মজুরী নেবার জন্যে কারখানা ঘরের সামনে এসে জমায়েৎ হ'চ্ছিল কুলি কামিনেরা। এক এক ক'রে মানুষগুলো পয়সা নিচ্ছে, বেরিয়ে আসছে। খবরদারী ক'রছিল তুনীচাঁদ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল একটা বিশেষ জায়গা লক্ষ্য ক'রে। সেখানে দাঁড়িয়ে বিহারীর সঙ্গে কথা বলছিল সুদাম।

একটু পরেই সুদামের ডাক পড়লো। গলা চড়িয়ে হাঁক দিচ্ছে তুনীচাঁদ,—কু-লি-ই সোদাম সদ্দার—সোদাম সদ্দা-আ-র—

ডাক শুনেই জোর পায়ে এগিয়ে গেল সুদাম। দরজার পাশ থেকে এক গাল শ্লেষের হাসি হেসে ছুনীচাঁদ বললে, বাবুরা তকে কী বুলছে ভালো করি শুনিস, বটে।

সুদাম কিছু না ব'লে বাবুদের টেবিলের দিকে গেল। ছুনীচাঁদের মুখে আবার ফুটে উঠলো সেই হাসি। বাইরে দাঁড়িয়ে তখনো যারা অপেক্ষা ক'রছে তাদের উদ্দেশ্যে অকারণে চেঁচাতে লাগলো, জল্‌দি করো সব। হাঁক শুনবে তো চটপট চলি আসবে। তমাদের হিসাব কিতাব হ'লে বাবুরা হাটকে যাবে। তিয়ার হই থাকো সব—হঁ।

পাওনা পয়সার জন্যে সবাই ব্যস্ত ছিল। ছুনীচাঁদের খবরদারীতে কেউ একটু হাসলে, কেউ বা সত্যি সত্যিই একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াতে লাগলো।

মজুরি নিয়ে বেরিয়ে এলো সুদাম। তার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নীরব হ'য়ে গেল ছুনীচাঁদ। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে তাকিয়ে একটা বিড়ি ধরাবার উদ্যোগ ক'রলে।

হঠাৎ বাঘের থাবার মতো সুদামের হাতখানা এসে পড়লো ছুনীচাঁদের কাঁধের ওপর। ছুনীচাঁদ মনে মনে হয়তো তৈরীই ছিল। সাঁ ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিখানা শক্ত ক'রে ধ'রলে।

সুদাম ক্ষ্যাপা পশুর মতো তার হাতখানা চেপে ধ'রে দাঁতে দাঁত পিসে বললে, তর কারসাজি?

ছুনীচাঁদও লাঠি তুলতে যাচ্ছিল। তার আগেই হা হা ক'রে পাঁচ সাতজন ছুটে এসে ছাড়িয়ে দিলে দু'জনকে। ছুনীচাঁদের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে সুদাম ব'ললে, এর বদলা আমি লিব।

অকথ্য ভাষায় তার উদ্দেশ্যে গালাগালি ক'রতে লাগলো ছুনীচাঁদ। সুদাম আর ফিরে তাকালে না। ভীড় ঠেলে বাইরে চ'লে এলো। নন্দীলাল আর বিহারীর হতভম্ভ মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আমি আর হাটকে যাব নাই, তরা যা।

তারা কিছু বলবার আগেই হন্‌হন্‌ ক'রে ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল সুদাম। তার দেহের সমস্ত রক্ত তখন মাথায় চ'ড়ে গেছে। চোখের সামনে যেন ভাসতে ভাসতে চ'লেছে ছুনীচাঁদের মুখের সেই শয়তানী হাসি। তারই পাশে ভেসে উঠছে মানীর সেই করুণ অনুনয়ের চাউনি। এই লোকটার ঘর যাতে না ভাঙে তারই জন্যে ব্যাকুল অনুরোধ

জানিয়েছে মানী!

কিন্তু সুদামের আশা আকাঙ্খার কথা কে ভেবেছে?

কেউ ভাবেনি। জটাধর নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। মানী তার মরদের জন্যে ব্যাকুল। পিয়ালি নিজের জিদের আগুনে ফেলে সুদামকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে চেয়েছিল। কেউ ভাবেনি সুদামের কথা। এমন কি সেই মূক মাটি, সেও কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছে তাকে। তবু সেই মাটির স্বপ্ন এখনো তার চোখে! তবু মানীর সেই ভালোবাসার নেশা এখনো তার বুকে!

হন্‌হন্‌ ক'রে হাঁটতে লাগলো সুদাম।

কাল থেকে এখানে কাজ জুটবে না। বিষবরণীর কাজ তার শেষ। দু'মুঠো ভাতের আশায় আবার হয়তো কোথাও গিয়ে নতুন করে কুলির খাতায় নাম লেখাতে হবে। আগুন জ্ব'লছে সুদামের মাথায়। বিষবরণী ছেড়ে চলে যাবার আগে দুনীচাঁদ আর মানীর শেষ পাওনা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে না গেলে কোথাও গিয়ে সে যে শান্তি পাবে না।

হাট থেকে ফিরে বিহারী আর নন্দীলাল খুব খানিকটা জটলা করলে। সুদাম তাদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে বাইরে এসে চুপ ক'রে বসে ছিল। লাঠি ঠুক্ ঠুক্ ক'রতে ক'রতে মাতামদাস বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। চাপা গলায় ডাকলে, কারিগর!

সুদাম একটা কথায় সাড়া দিয়ে আগের মতোই চুপ ক'রে বসে রইলো। মাতামদাস এসে তার পাশে বসে বললে, আখন রুজি রোজগারের কী পথ করবে কারিগর?

ঠিক নাই। নিস্পৃহ স্বরে সুদাম উত্তর দিলে।

দু'একবার গলা খাঁকারি দিয়ে মাতামদাস বললে, আমার কথা শুনবে তো বলো।

কী কথা তমার?

ঝুমরিয়ার পেশা লিবে?

ঝুমুরে আমি থুক দিই।

মাতামদাস একটু ক্ষুন্ন হ'ল। মিহিস্বরে বললে, তমার খালি একটাই কথা। পিয়ালি ছাড়া কি পরগণায় আর ঝুমুর মেয়্যা নাই? আমার সঙ্গে

পুবে চলো, তমাকে আমি ভালো নাচনীর ঝুমরিয়া করাবো।

সুদাম তিক্তকণ্ঠে বললে, আপন রুটি-রুজির ভাবনা ভাবো বায়েন, আমার ভিন্ পথ আছে।

মাতামদাস চুপ ক'রে রইলো। জটাধরের দল ভেঙে যাওয়ার পর সে খুব উদ্‌বিগ্ন মনেই মৌলবনীতে এসেছিল। পিয়ালি তাকে যেমন সঙ্গে সঙ্গে রেখেছে, এতখানি কে করবে? অনেক চিন্তা মাথায় করে সে গিধনিতে ফিরে যাচ্ছিল। বিহারীর কাছে সুদামের খোঁজ পেয়ে হঠাৎ আবার অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছে। সুদামকে যদি কোনোরকমে রাজী করানো যায় তাহলে অন্তত একজন চেনা মানুষের ভরসায় আবার নিশ্চিন্ত পথে পা বাড়ানো যাবে।

কথাটা বলি বলি করেও বলা হ'য়ে ওঠেনি। হঠাৎ এরকম একটা সুযোগ জুটে যাবে তাই বা কে ভেবেছিল? কিন্তু সুদাম বরাবর সেই একরোখা গোঁ নিয়ে আজ পর্যন্ত যেমন বেঁকে বসে আছে, তাতে মাতামদাসের সব আশাই শেষ হ'য়ে গেল।

কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলো মাতামদাস। তারপর আবার একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে বললে, কিন্তুক একটা কিছু উপায় তো তমার চাই কারিগর?

সুদাম ব'ললে, কেনে ভাবো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাতামদাস ব'ললে, কেনে ভাবি, তা কি আমি জানি!

এমন সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বিহারী। কোনোরকম ভূমিকা না করে সে বললে, সোদাম, আমার কথা শুন্। চৌকিদার তকে বরখাস্ত করালো কিনা? তর পছন্দী মেয়্যাটো উয়ার ঘর করছে কিনা বল্?

সুদাম চোখ তুলে তাকালে বিহারীর দিকে।

উৎসাহ পেয়ে বিহারী বললে, মেয়্যাটো ছিনাইঁ লিই যা। সাঙা করি সাজা দে চৌকিদারকে।

দাঁতে দাঁত পিষে সুদাম বললে, হুঁ।

বিহারী খুশী হ'য়ে বললে, না পারিস তো বল্, পাথর ছুঁড়ি মাথাটো অর চার ফাঁক করি দিব আমি।

সে কথার উত্তরে একটু হেসে উঠে পড়লে সুদাম। সে হাসির আড়ালে প্রতিহিংসার আগুন জ্ব'লছে দাউ দাউ করে।

দিন তিনেক কেটেছে তারপর।

হঠাৎ সেদিন বিকেলবেলায় ছুটতে ছুটতে এলো বিহারী। খুশিতে চক্‌চক্ করছে তার মুখ। সুদামকে কাছে ডেকে নিয়ে বিহারী তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বললে, চৌকিদারের বউটোর সা*ং আমার দিখা হ'ল রে সোদাম!

মুহূর্তের মধ্যে উৎকর্ণ হয়ে উঠলে সুদাম। বিহারী বললে, তর কথা শুধালো আমাকে। আমি বল্‌লম, তু চলি যাবি।

সুদাম উন্মুখ আগ্রহে বললে, মানী কিছু বুললো নাই রে?

নাই রে। হতাশভাবে উত্তর দিলে বিহারী। তারপর মুচকি হেসে বললে, মেয়্যাটো বেটার মা হবে দেখিস।

একটা চাবুকের ঘা যেন এসে পড়লো সুদমের মুখে। বিবর্ণ মুখে বিহারীর দিকে তাকিয়ে সে বললে, হ'ক।

বিহারী ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। দু'পা এগিয়ে হঠাৎ এক লাফে পিছিয়ে এসে বললে, আসল কথাটো ভুলি যেছিলম রে সোদাম। চৌকিদারকে বাবুরা টিশনকে লিই গেল তাখন। ফিরতে সি অনেক রাত হবে বটে।

রুদ্ধশ্বাস চেপে সোদাম বল্‌লে, কেনে?

রাতের পার্শ্বেল গাড়ীকে মাল তুলতে গেল। চৌকিদারও যাবে নাই, বাবুরাও ছাড়বে নাই; হি-হি।—

বিষবরণীর উপত্যকাটা যেন ভুমিকম্পের দোলায় দুলতে লাগলো সুদামের চোখের সামনে।

সুযোগ এসেছে আজ!

রাতের অন্ধকার নেমে এলো সিক্কাই পাহাড়ে। শোঁ শাঁ ক'রে ব'য়ে চলেছে রাতের বাতাস। মদের ঘোরে বেহুঁশ হ'য়ে পড়ে আছে বিহারী আর নন্দীলাল। মাতামদাসও ঘুমিয়ে পড়েছে। যেচে তাদের সবাইকে আজ আকণ্ঠ মদ খাইয়েছে সুদাম। নিজে খায়নি।

কাছেই কোথায় একটা পাখী কর্কশ চীৎকার করে উঠলো। অন্ধকার ঘরে চমকে উঠলো সুদাম। হাতড়ে হাতড়ে নিজের কম্বল গামছা আর জামাটা সে আগেই গুছিয়ে রেখেছিল। ঘরের কোণে একটা জায়গায় লুকানো ছিল

মানীর সেই ঝুম্‌কোটা। সেটাও তুলে নিলে। নন্দীলালের ছোরাখানা হাতে তুলেও রেখে দিলে। মানীর নরম গলাটার পক্ষে তার নির্মম বলিষ্ঠ হাত দু'খানাই যথেষ্ট!

শেষবারের মতো এতদিনকার সহচরদের দিকে একবার তাকিয়ে নিলে সুদাম। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

কালো অন্ধকারে মিশে হন্‌হন্‌ ক'রে উঁচু নীচু পথে কুঠির দিকে ছুটে চললে সুদাম। বিষবরণীর জল পেরিয়ে উঠতে লাগলো সেই খাড়াই পথ ধরে। এই পথ দিয়েই জলের ঘটি নিয়ে সেদিন নেমে এসেছিল মানী!

শুকনো পাতায় পাতায় পায়ের চাপে মচ্‌মচ্‌ শব্দ হচ্ছে। তাও খেয়াল নেই সুদামের। উন্মাদের মতো কুঠির বারান্দায় উঠে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলে।

দড়াদম্‌ ক'রে দরজা খুলে গেল।

সামনে সুদামের ওই মূর্তি দেখেই সহসা আঁৎকে উঠে অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠলে মানী। এ কোন্‌ সুদাম!

কাঁধের বোঁচকা মাটিতে ফেলে দিয়ে ঝুম্‌কোটা বার করে ঘরে ঢুকে মানীর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে সুদাম বললে, চিনতে পারিস?

নীরবে ঘাড় নেড়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়লে মানী। তার সমস্ত দেহ তখন এক অসহ্য বেদনার ভারে কুঁকড়ে যাচ্ছে। চোখ দু'টো অসহায় এক বিহংগীর মতো একটু আশ্রয় খুঁজছে। হাতের সমস্ত আঙুলগুলো দিয়ে মাটী আঁকড়ে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে সে চীৎকার ক'রে উঠলে, বাইরে যা সোদাম। কে তকে আসতে বুল্‌ছে?

কিছু হুঁশ নেই সুদামের। উন্মাদের মতো মানীর কাঁধ দু'টো ধ'রে ঝাঁকুনি দিতে যাচ্ছিল। প্রাণপণ শক্তি দিয়ে সুদামের হাত দু'খানা ঠেলে দিয়ে ক্ষীণ ভর্ৎসনার স্বরে মানী বললে, হায়া নাই তর! কিছু বুঝিস নাই? দেখ্‌তে পেছিস্‌ নাই আমার অবস্থা? যা—

হতচকিত হ'য়ে মানীকে ছেড়ে দিলে সুদাম। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে মেঝের ওপর শুয়ে পড়লে মানী। গলার শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে। বুকের কাপড় লুটিয়ে প'ড়েছে মাটিতে। স্তন্যরসে স্ফীত স্তনযুগল অনাবৃত হ'য়ে গেছে। সে খেয়ালও নেই। সুতীব্র বেদনার সংকেত দিয়ে তার সন্তান পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসবার খবর পাঠিয়েছে।

বিহ্বলের মতো কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলো সুদাম। পরক্ষণেই হাঁটু মুড়ে ব'সে সযত্নে মানীর বুকের আঁচলটা তুলে দিয়ে ব'ললে, আমি বাইরে থাকলম, দরকার পড়লে ডাকিস্।

বাইরে এসে দরজার কপাট টেনে দিলে সুদাম। ঘরের ভেতর থেকে মানীর একটানা যন্ত্রনাকাতর ধ্বনি ভেসে আসছে।......

মুহূর্তের পর মুহূর্ত কেটে যেতে লাগলো।

অস্থির উত্তেজনায় পায়চারি ক'রতে লাগলো সুদাম। বাইরে নিবিড় অন্ধকারে কেঁদজগংলের ভেতর টিপ্‌টিপ্ ক'রে জ্ব'লছে কতকগুলো জোনাকির আলো।

দু'তিনটে বিড়ি শেষ হ'য়ে গেল।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে ভেসে এলো সদ্যোজাত শিশুর কান্না।

পাগলের মতো দরজা খুলে ঘরে ঢুকে গেল সুদাম। অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো মানীর মুখের দিকে। সমস্ত বেদনার শেষে এক অবশ ভংগীতে মাটিতে শুয়ে আছে মানী। বুকের কাছে একটা তামাটে রঙের জ্যান্ত ছোট্ট পুতুল।

অত ক্লান্তির মধ্যেও সুদামের মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠলো মানীর ওষ্ঠে। ক্ষীণ নির্জীব স্বরে ব'ললে, মেয়্যা হ'ল রে সোদাম!

সুদাম বিমূঢ়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো মানীর দিকে।

এই সেই মানী! রকন ডুংরির ওপর বনতুলসীর ঝোপের পাশে ব'সে যাকে নিয়ে বিহ্বল আবেশে সে অফুরন্ত স্বপ্ন রচনা ক'রেছিল!......

হঠাৎ চমক ভাঙলো সুদামের। শীতে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে মানী। অসাড়ের মতো প'ড়ে আছে শিশুটা। তামাটে পুতুলটার গায়ে কিছু ঢাকা না দিলে ওটা যে মরে যাবে!

দ্রুত হাতে নিজের পুঁটুলিটা খুলে কম্বলখানা নিয়ে এগিয়ে গেল সে। সযত্নে দু'জনের গায়ের ওপর কম্বলখানা চাপা দিয়ে বললে, মেয়্যাকে ভালো করি জড়াই রাখ্‌রে মানী!

মানীকে অনুরোধ ক'রেও নিজে কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে না। আরও ভালোভাবে সদ্যোজাত শিশুটাকে কম্বলে মুড়ে দিয়ে এক প্রসন্ন হাসি নিয়ে তাকালে মানীর দিকে।

কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটে উঠলো মানীর পাণ্ডুর ওষ্ঠে।

সবকিছু যেন গোলমাল হয়ে গেছে। অবাক হয়ে সুদাম দেখতে লাগলো মানীর মুখখানা।

ঝুমকোটা তখনো দরজার কাছেই পড়ে ছিল। সেটাকে কুড়িয়ে এনে মানীর অবশ হাতের পাতায় রেখে গাঢ়স্বরে বললে, আমি তো নতুন করি ওকে আর পরাতে লারলম রে! তর মেয়্যা ডাগর হ'লে ইটা তাকে পরাস।

মানীর চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু'ফোঁটা জল। স্তিমিতস্বরে প্রশ্ন করলে, তু চলি যাবি সোদাম?

হঁ, যাবো।

কুশমণ্ডলকে?

নাই।

তর জমিনটুকুও বাঁচাবি নাই?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুদাম বললে, জমিনকে আর আমার কী হবে রে! মাটি আর ভুমজকে চায় না, উয়ার বড়ো মান। তরই পারা মান উয়ারও!

মানীর অবশ চোখের পাতায় ক্লান্তির তন্দ্রা নেমে আসছে। তবু কী এক দুঃসহ অনুভূতির আবেগে সে প্রাণভ'রে দেখতে লাগলো সুদামকে। চোখের জল আর বাধা মানে না।

সুদামও' চোখ ফিরিযে নিতে পারলে না।

......কত স্মৃতি, কত আনন্দ বেদনার টুকরো মুহূর্তগুলি এক এক ক'রে এসে ভীড় করছে মনের ভেতর। মাটিও রইলো না, মানীও রইলো না। কুশমণ্ডলের প্রান্তরে এতদিন ধ'রে সূর্য যেমন উঠেছে, তেমনি উঠবে। আকাশ জুড়ে বর্ষার কালো মেঘ বছরে বছরে যেমন উড়ে আসতো তেমনিই আসবে। মাঠে মাঠে পাকা ধানের শীষ বাতাসে লুটোপুটি খাবে। সবই থাকবে আগের মতো। থাকবে না শুধু সুদাম। কে মনে রাখবে? তার কথা।

তবু সুখে থাকুক সবাই। সুখে থাকুক মানী আর দুনীচাঁদ।......আর সেই পাগল ঝুমুর মেয়েটাও যেন কোনোদিন একটু শান্তি পায়।......

মানীর ক্লান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে সুদাম বললে, নিদ্ যা মানী।

মানী করুণস্বরে বললে, পারিস্ তো আপন ভিটাকে ফিরি যাস্ সোদাম!

কী একটা জবাব দিতে গিয়েও সুদাম থেমে গেল। হঠাৎ উৎকর্ণ হ'য়ে কয়েকমুহূর্ত কী যেন শুনতে লাগলো।

মোটর গাড়ীর শব্দ এগিয়ে আসছে। বাবুরা ফিরে আসছে স্টেশন থেকে। দুনীচাঁদও নিশ্চয়ই ফিরে আসছে সেই সঙ্গে।

দ্রুতহাতে গামছা আর জামার ছোট্ট পুঁটলিটা বেঁধে নিয়ে সুদাম বললে, তর মরদ আসছে মানী, আমি যাই।

মানী কোনো কথা বলতে পারলে না। হু হু করে জল নেমে এলো তার দু'চোখ বেয়ে।

আস্তে দরজার কপাট ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালে সুদাম। শাল জংগলের ফাঁক দিয়ে ছুটে এগিয়ে আসছে গাড়ীর তীব্র আলো। নিবিড় অন্ধকারের দিগন্তব্যাপী ওড়নায় ঝলমল করছে অসংখ্য তারার চুমকি।

কুঠির বারান্দা থেকে নীচে নেমে এলো সুদাম। পুঁটলিটা তুলে নিলে লাঠির ডগায়। বোঝা অনেক হাল্কা হয়ে গেছে। অনেক বোঝা হয়তো হাল্কা ক'রে রেখে গেল আজ মানীর কাছে।

আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার নিকষ কালো দেহটা।

রাতের প্রহরী অগণ্য তারকা। সাক্ষী শুধু সেই রাতের প্রহরীদল। শুধু তারাই জানে কুশমণ্ডলের করালী সর্দারের নাতি সুদাম সর্দার কোথায় গেল!